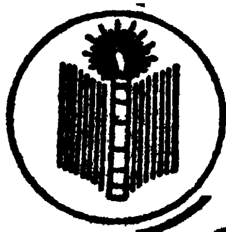
উত্তর পুরুষ

উত্তর পুরুষ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র



ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'দাহু আমার একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

বিছানায় শুতে গিয়ে হঠাৎ ঠাকুরমার কথা মনে পড়ে গেল বাচ্চুর। বালিশে মুখ গুঁজে সে ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কথাগুলি অন্যমনস্ক অখিলবন্ধুর কানে গেল না। তিনি হ্যারিকেনের আলোয় জমা-খরচের খাতা লিখছিলেন। একদিন আগে স্ত্রীকে কবর দিয়ে এসেছেন। তাতে মোট কত খরচ হয়েছে সেই হিসাব। কফিন, নতুন কাপড়, ফুলের তোড়া, কোন্ খাতে কত ব্যয় হয়েছে সব লিখে রাখছিলেন অখিলবন্ধু। তাঁর এই জমা-খরচ লেখার অভ্যাস বহুদিনের। ছেলেবেলায় শহরের বোর্ডিং-হাউসে থেকে স্কুলে পড়তেন। গ্রাম থেকে মাসে মাসে দশ টাকা করে পাঠাতেন তাঁর বাবা। তিনি একবার রাগ করে বলেছিলেন, 'টাকাগুলি যায় কোথায়? উড়িয়ে পুড়িয়ে দিস? না বন্ধুদের নিয়ে ময়রার দোকানে গিয়ে বসিস?'

বাবার কথায় বড় দুঃখ পেয়েছিলেন অখিলবন্ধু। তাঁকে পাই-ফার্দিংএর হিসাব মিলিয়ে দেওয়ার জন্যে রোজ শোবার আগে জমা-খরচ লিখতে শুরু করেছিলেন। ষাট বছর হয়ে গেছে বয়স কিন্তু সেই অভ্যাস আজও আছে। লোকে যেমন ডায়েরি রাখে তিনি রেখেছেন জমা-খরচ। কতকগুলি জিনিষের নাম আর সেগুলির জন্যে কত ব্যয় হ'ল তারই হিসাব। কত সুখের দিন, দুঃখের দিন, জন্ম-মৃত্যু আনন্দ বিষাদের ইতিহাস এই লম্বাটে খাতাগুলির মধ্যে ধরা রয়েছে, আর কেউ না জানুক অখিলবন্ধু জানেন। খাতাগুলি

তাড়া বেঁধে বেঁধে বড় কাঠের বাক্সটায় সব জমিয়ে রেখেছেন অখিলবন্ধু। মাঝে মাঝে সেগুলি খুলে খুলে দেখেন। এই নিয়ে তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে কত ঝগড়া করেছেন। রাগ করে বলেছেন, 'কী মণি-মুক্তো আছে তোমার ওই খাতার মধ্যে? কত লাখ টাকার সম্পত্তি করেছো যে রোজ তার হিসাব না করলে ঘুম আসে না তোমার?' আজ সেই নলিনীর শেষ কাজের হিসাবও লিখে রাখছেন অখিলবন্ধু। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগ করছে না হাসছে তা আর বুঝবার জো নেই। আজও কি সে খাতাটা কেড়ে নিয়ে যাবে? বলবে, 'হয়েছে। তোমার মহাজনী এবার রেখে দাও। চলে এসো। রাত অনেক হল, দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলি।'

নলিনীর এ কথাগুলি কোনদিন আর শুনতে পাবেন না অখিলবন্ধু। সে আর কোনদিন হাতের খাতাও কাড়বে না, হৃদয়ের ভালোবাসাও কেড়ে নিতে আসবে না। অখিলবন্ধুর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বাচ্চু এবার ডাকল, 'দাদু, আমার একা একা ভয় করছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে তুমি শুতে এসো।'

এবার নাতির ডাক কানে গেল অখিলবন্ধুর। চমক ভাঙল, লজ্জিত হলেন তিনি। অসম্পূর্ণ হিসাবের খাতাটা সরিয়ে রেখে তিনি তক্তপোষের ধারে এসে দাঁড়ালেন। বাচ্চুর মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই বুঝি তোমার বীরত্ব? ভয় কিসের রে বোকা ছেলে?'

বাচ্চু বলল, 'ওই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছগুলো আমি দেখতে পারিনে। তুমি জানলাটা বন্ধ করে দাও।'

অখিলবন্ধু জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের ঘন অন্ধকারে গাছপালাগুলোকে কিছু কিম্ভূতকিমাকারই দেখাচ্ছে বটে। বাড়ির সঙ্গে লাগা অখিল-বন্ধুর চৌদ্দ বিঘা জমি আর বাগান। আম আছে, নারকেল আছে, লিচু আছে, পশ্চিমের দিকে গোটা ছয়েক বাঁশঝাড়ও রয়েছে। তাছাড়া ফাঁকা জমিতে কিছু আখের চাষ করেন অখিলবন্ধু। খানিকটা জমিতে বোনেন ছোলা মুশুরী অরহর। এই বাগানের দক্ষিণপ্রান্তে ছ'বছর আগে একমাত্র ছেলে অতুলের শেষ শয্যা তৈরি করেছিলেন অখিলবন্ধু। আর কাল তার পাশে শুইয়ে রেখে এসেছেন পঁয়ত্রিশ বছরের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী নলিনীকে। এতদিনে সে শান্তি পেয়েছে। শেষ দিন পর্যন্ত ছেলেকে সে ভুলতে পারেনি।

আকাশে মেঘ। তাই অন্ধকারের ঘটাটা একটু বেশি। রাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি হবে। যা গরম পড়েছে তাতে জোর বৃষ্টি এসে নামবে বলেই মনে হচ্ছে। এই গরমে মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ করবার ইচ্ছা ছিল না অখিলবন্ধুর। তাতে ঘরের গুমোট আরো বাড়বে। কিন্তু পাছে বাচ্চু ভয় পায় তাই বন্ধ করে এলেন।

এসে নাতির মাথার কাছে বসলেন অখিলবন্ধু। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে একটু হাসলেন, 'তোর অত ভয় কিসের রে বোকা ছেলে। ওগুলো তো আমাদেরই আমগাছ। কত আম ধরেছে গাছে। আর ক'দিন বাদেই পেকে রাঙা টুকটুকে হবে। দিব্যি খেতে পারবি।'

বাচ্চু বলল, 'দাদু, এবার আর ঠাকুরমা আমসত্ত্ব দেবে না।'

অখিলবন্ধুর বুকের মধ্যে কিসের একটা খোঁচা লাগল। একটু-কাল চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'না, সে আর

কোত্থেকে আমসত্ত্ব দেবে? স্বর্গে তো আর আমটাম কিছু পাওয়া যায় না। এখানে বসে আমসত্ত্ব আমরাই দেব। আমি আর তুই দুজনে মিলে খুব আমসত্ত্ব দেব কি বলিস্? গাছে যে আম আছে তা ছাড়াও অনেক আম কিনে আনব—।'

বাচ্চু বলল, 'তুমি কি আর ঠাকুরমার মত অত ভালো আমসত্ত্ব দিতে পারবে? ওসব কি আর পুরুষ মানুষে পারে?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'তা আর কি করব দাদু। তোর ঠাকুরমা যখন আমাদের ছেড়েই গেল মেয়েমানুষ আর পাব কোথায়? তুই যখন বড় হবি, বিয়ে করবি, তখন টুকটুকে আম দিয়ে টুকটুকে নাত-বউ ফের আমসত্ত্ব দেবে। ততদিন পর্যন্ত রেওয়াজটা আমাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

বাচ্চু তের উৎরে চৌদ্দয় পড়েছে। বিয়ের ব্যাপারটা বেশ বোঝে। বউয়ের কথায় লজ্জিত হয়ে বলল, 'দূ-র।' তারপর অখিল-বন্ধুর রোগাটে লম্বা হাতখানা কোলের কাছে টেনে নিয়ে আরো আস্তে আস্তে আরো সংকোচের সঙ্গে বলল, 'দাদু, আমার মাকে আনিয়ে নিলে হয় না?'

অখিলবন্ধু নিজের হাতখানা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিলেন, সরিয়ে আনলেন, যেন সাপের ছানা তার ছোট দাঁত বসিয়ে দিয়েছে।

তিনি নিজের মনেই বললেন, 'চিড়িয়া খায় দায় আর বনের দিকে তাকায়। কেবল মা আর মা। তবু যদি সেই মা পালত পুষত, বুক দিয়ে আগলাত। হতভাগা বাঁদর কোথাকার।'

বাচ্চু একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'দাদু, তুমি কি রাগ করেছ?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'না, রাগ করব কেন?'

বাচ্চু বলল, 'তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বসলে যে?'

অখিলবন্ধু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি এখন ঘুমোও। আমি আমার বাকি কাজটুকু সারি।'

বাচ্চু এগিয়ে এসে ফের তাঁর হাত টেনে ধরল। বলল, 'না দাদু, তুমি যেতে পারবে না। তুমি আমার কাছে শোও এসে। একা একা আমি থাকতে পারব না। আমার ভারি ভয় করে।'

অখিলবন্ধু ফের এগিয়ে এলেন। আচ্ছা মায়ার বাঁধনে পড়েছেন তিনি। যে সব বাঁধন থাকবার তাই ছিঁড়ে গেল। আর এ তো একগাছি সুতো।

বাচ্চু বলল, 'দাদু, আমি আর মার কথা মুখে আনব না। তুমি আমার উপর রাগ করো না।'

অখিলবন্ধু নাতির কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমি তো তোকে মুখে আনতে নিষেধ করিনি। কিন্তু তুই তো এখন বড় হয়েছিস্, সবই বুঝতে পারিস্। তোর মা আর একজনকে বিয়ে করেছে। সেখানে তার দুটি ছেলে-মেয়ে হয়ে গেছে। নতুন ঘর-সংসার নিয়ে সে ব্যস্ত। সে আর আমাদের নেই। তাকে ডাকাডাকি করে আমাদেরও অশান্তি।'

বাচ্চুর মনে পড়ল, গতবার শীতের সময় তার যখন খুব জ্বর হয়, বাচ্চুর মা খবর পেয়ে তাকে দেখতে এসেছিল। কমলালেবু, আঙুর, বেদানা সব এনেছিল সঙ্গে। অত ভালো ভালো ফল দাদু আর ঠাকুরমা তাকে কোনদিন খেতে দেয়নি। তার দাদু বড্ড গেঁয়ো। ফলের মধ্যে শুধু চেনে আম, জাম, কলা আর কাঁঠাল। বড়জোর আনারস। কত আদর করে বাচ্চুর মা কমলালেবুর কোয়াগুলি তার মুখে তুলে দিয়েছিল। তারপর দাদু আর ঠাকুরমা ঘর থেকে

বেরিয়ে গেলে বাচ্চুর মা তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তোর ঠাকুরদা ঠাকুরমা আমাকে যতই পর মনে করুন আমি তোর পর নই। কোনদিন আমি তোর পর হবও না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব তুই আমারই থাকবি।'

বাচ্চুর মনে হয়েছিল যেন স্বর্গের দেবী এসে তার সঙ্গে কথা বলছেন। হিন্দুদের দুর্গা কি লক্ষ্মী প্রতিমার মতই তার মুখ, নাক, চোখ, রং। প্রতিমার মতই তার মা সুন্দরী। বাচ্চুরা ধর্মে খ্রীষ্টান কিন্তু আচার আচরণে হিন্দু। তাদের পাড়াপড়শী সবাই হিন্দু। বন্ধুবান্ধবদের বেশির ভাগই তাই। এদিক থেকে অখিলবন্ধুর কোন গোঁড়ামি নেই। তিনি বলেন, 'আসলে দু রকমের মানুষ আছে, বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী। ভগবান যারা মানে আর যারা মানে না। যারা মানে তারা হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক আর খ্রীষ্টানই হোক সব এক।'

হিন্দু পাড়াপড়শীরা বাচ্চুর দাদুকে ভালোবাসে। কিন্তু তার মা তাকে যেমন ভালোবাসে তেমন আর কেউ না। মাকে বাচ্চুর মনে হয় কখনো দেবী, কখনো পরী, কখনো রূপকথার রাজকন্যা। মাও ভালো, দাদুও ভালো। মাও বাচ্চুকে ভালোবাসে তার দাদুও তাকে ভালোবাসে। তবু দুজনের মধ্যে বনিবনাও নেই, তবু কেউ কাউকে দেখতে পারেনা কেন ভেবে বাচ্চু অবাক হয়ে যায়।

ঠাকুরমার শোকের কথা ভুলে গিয়ে মার কথা ভাবতে লাগল বাচ্চু। মা বলেছিল, 'যখনই দরকার হবে, আমার ঠিকানা রইল, পোষ্টকার্ড কিনে দিয়ে গেলাম, আমাদের টালিগঞ্জের বাড়িতে চিঠি লিখিস। খবর পেলেই আমি চলে আসব। কি কাউকে পাঠিয়ে দেব।'

নতুন জামা আর প্যান্ট নিয়ে এসেছিল মা। আর লুকিয়ে তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, 'তোর যা খুশি তাই কিনে নিস।'

মা কী ভালো। দাদু কি ঠাকুরমা কোনদিন তাকে একটা টাকা তো ভালো একটা আনিও দেয়নি। বাচ্চুর দাদু ভারি কৃপণ সবাই একথা বলে। বাচ্চুরও তাই মনে হয়। বাচ্চুকে তার দাদু সব কিনে দেয় কিন্তু একটি পয়সাও নিজের হাতে খরচ করতে দেয় না। এমন কি টিফিনের রুটি-তরকারি পর্যন্ত বাড়ি থেকে দিয়ে দিত ঠাকুরমা, পাছে বাচ্চু বাজে তেলেভাজা টেলেভাজা কিনে খায়। কেবল না না না না। বাচ্চু যা করতে যাবে তাতেই এদের মানা। বাচ্চুর ভালো লাগেনা এত বাধা-নিষেধ। তার ইচ্ছে করে একদিন কোথাও পালিয়ে যায়। তার ইচ্ছে করে জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে, রেলগাড়ির ড্রাইভার হতে, এরোপ্লেনের পাইলট হতে। এক এক-দিন এক একটা হতে তার সাধ যায়। বসে বসে বই মুখস্ত করতে তার মোটেই ভালো লাগেনা। কিন্তু দাদু আর ঠাকুরমা তাকে কেবল পড়তে বলে। ঠাকুরমা আর বলবেনা, ঠাকুরমা আর কোনদিন বকবেও না, আদরও করবে না। দিনে বকত ঠাকুরমা কিন্তু রাত্রে কী আদরই না করত। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ঘুমোত। আজ কার কোলের মধ্যে ঘুমোবে বাচ্চু? আজ আর কেউ নেই। আজ সারা বিছানাটা খালি। বাচ্চু যেন শূন্যে ভাসছে, তাকে ছোঁবার কেউ নেই, ধরবার কেউ নেই। বাচ্চুর আবার কান্না পেল। তার ইচ্ছা হল, হাউ হাউ করে কাঁদে। বাচ্চু ঠাকুরমার বদলে কোল বালিসটা বুকে জড়িয়ে তাতে মুখ গুঁজে ফের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বাচ্চ ঘুমিয়েছে ভেবে

তার দাদু আবার গিয়ে জমা-খরচ লিখতে বসেছে। লিখুক, বাচ্চু আর তাকে ডাকবেনা। কখনো ডাকবেনা।

অখিলবন্ধু হ্যারিকেনের আলোয় জমা-খরচের খাতাই ফের খুলে বসেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর ব্যারিয়ালের খরচ লিখতে আজ যেন ঠিক আর মন লাগছিল না। অনেক খরচের কথা বাদ গেল। যাক। আর হিসাব মিলিয়ে কী হবে।

অখিলবন্ধু খাতার একটা সাদা পাতা খুলে নিজের মনে লিখতে লাগলেন 'জমা—বাচ্চু। খরচ—অতুল, নলিনী, বাচ্চুর মা ইভা।'

ইভা—অখিলবন্ধুর ছেলের বউ, নাতির মা। এখনো বেঁচে আছে। তবু সে তাঁদের কেউ নয়, সেও আজ খরচের খাতে।

অখিলবন্ধু একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

অখিলবন্ধুর দিনের চেহারা আর একরকম। লম্বা কালো ছিপ-ছিপে শরীর। মেদমাংসের ভার তাতে নেই। শুধু বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছে। মুখে দিন কয়েকের কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমেছে। খোলা গা। পরনে আটহাতি ধুতি।

বাইরের দিক থেকে রাত্রেও এই চেহারার কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মনটা বড় নরম হয়ে যায়। খানিকটা দূরে যশোর রোডের বাস আর লরি চলার শব্দ থামতে থামতে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তখন এই অন্ধকার গাছপালা, ক্ষেত-বাগান সামনে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে অখিলবন্ধুর মনটা বড় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ঘুমের মধ্যে বোবায় পেলে যেমন অবস্থা হয়, তেমনি একটা গুমরানো অনুভূতিতে সমস্ত মন ছেয়ে যায় অখিলবন্ধুর। নারকেল গাছগুলির মাথার অনেক উপরে কয়েকটা তারা মিট মিট করে। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। গোয়ালে দুটো গরু লেজ নেড়ে নেড়ে মশা তাড়ায়—সে শব্দ কানে আসে। তারপর আবার চুপচাপ। নলিনী মাঝে মাঝে তাড়া দিতেন, 'বারান্দায় কতক্ষণ আর ভূতের মত বসে থাকবে? শোবে না?' কিন্তু যেতে যেতেও বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগত অখিলবন্ধুর। উঠি-উঠি করেও উঠতে ইচ্ছা করতনা।

নলিনী আবার তাগিদ দিতেন।

এখন আর তাড়া দেবার কেউ রইল না। কথায় কথায় ঝগড়া,

কথায় কথায় কারো বিরক্তি আর মুখনাড়া সহ্য করবার হাত থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছেন অখিলবন্ধু। বাচ্চুকে ঘুম পাড়িয়ে তিনি এই বারান্দায় বসে বসে যদি রাত ভোর করেও ফেলেন, তবু কেউ কিছু বলতে আসবেনা।

কাল অনেক রাত অবধি এইসব এলোমেলো ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করে এসেছিল অখিলবন্ধুর। মনটা হয়েছিল সরা-ঢাকা ভাতের হাঁড়ির মত। ভিতর থেকে বাষ্প বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু পারছেনা। অস্বস্তিটা কোথায়, বুকের মধ্যে না মাথার মধ্যে ঠিক যেন বুঝবার যো নেই। বুঝতে পারলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন অখিলবন্ধু। ব্যথা যে কোথায় তাই কি তিনি ঠিক করে বলতে পারেন যে মলম লাগাবেন, মালিস দেবেন।

কিন্তু ভোর হতে না হতেই অখিলবন্ধুর মনের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। সেখানে আর আঁধার নেই, আর্দ্রতা নেই, দিব্যি খট্‌খটে ঝক্‌ঝকে উঠোনের মতই অখিলবন্ধুর পরিচ্ছন্ন মন এখন তাঁর কর্মব্যস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযোগী হয়ে উঠেছে। ভোর থেকেই তাঁর কাজের শুরু। গরু দুটোকে গোয়াল থেকে বার করে দোয়াতে হবে। ঘাস-জল দিতে হবে তাদের। চাকরটা দুদিন ধরে কাজে কামাই করছে। কিন্তু তাই বলে তো অখিলবন্ধু খদ্দেরদের দুধের রোজ বন্ধ করতে পারেন না।

ডাকাডাকি করে তিনি বাচ্চুকে তুললেন, গোয়াল থেকে গরু বার করে বড় একটা বালতি কোলের কাছে নিয়ে দোয়াতে বসলেন। বাচ্চুকে ডেকে বললেন, 'গামছা নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে থাক। মশা মাছি তাড়াবি।'

বাঁটে তেল মাখালেন, বাছুর দিয়ে টানিয়ে নিলেন। দুধের

ধারায় তাঁর বালতি ভরে উঠতে লাগল। সাদা সাদা ফেনা জমল ওপরে। আর দুধের সেই রকম আর ঘনতা দেখে অখিলবন্ধু এই মুহূর্তে সমস্ত দুঃখ ভুলে গেলেন। খাতায় যে জমার অঙ্কের চেয়ে খরচের অঙ্ক ভারি এখন আর তাঁর মনে নেই। তিনি নাতির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'দেখেছিস দুধ? এমন খাঁটি দুধ সারা বারাসতে আর কোথাও নেই।'

দুটো গরুতে সের পনের দুধ হয় আজকাল। দু সের নিজেদের জন্যে রেখে বাকীটা সব অন্যের কাছে বিক্রি করেন অখিলবন্ধু। মাসিক বরাদ্দ আছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, উকিল, আর মুন্সেফ এমনি করে পাঁচঘরের মধ্যে সব দুধ বাঁটোয়ারা হয়ে যায় অখিলবন্ধুর। তাঁর দুধ নির্ভেজাল খাঁটি বলে অনেকেই তাঁর কাছে দুধ চায়। কিন্তু অত দুধ জোগাবেন কী করে অখিলবন্ধু। তাঁর গরু দুটো তো আর মণখানেক দুধ দেয় না। আধ মণ দিলেও কথা ছিল।

দুধ দোয়া হয়ে যাবার পর গায়ে আধময়লা বোতামহীন ফতুয়াটা চড়িয়ে নিজেই বালতি হাতে বেরিয়ে পড়লেন অখিলবন্ধু।

বাচ্চু পিছন থেকে ডেকে বলল, 'দাদু, তুমি আজও নিজে দুধ নিয়ে বেরোচ্ছ?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'আমি বেরোব না তো কে বেরোবে? তুই বয়ে নিয়ে যাবি বালতি?'

বাচ্চু বলল, 'ঈস, বয়ে গেছে আমার। কেন, পরেশ আছে, গোবিন্দ আছে ওদের বল। তুমি নিজের হাতে ওই ভারি বালতিটা আর টানাটানি কোরোনা দাদু। লোকে তোমাকে আড়াল থেকে হাড়-কেপ্পন বলে, আর বলে গয়লা। শুনতে ভারি খারাপ লাগে।'

অখিলবন্ধু একমুখ হেসে বললেন,'কেন, গয়লার নাতি হলে তোর বুঝি জাত যায়? তোর বুঝি ইচ্ছে লাট সাহেবের নাতি হবি। এই চাষী গয়লা আকাট মূখ্যু ঠাকুরদাকে বুঝি পছন্দ হচ্ছে না তোর?'

দু-পা এগিয়ে এসে অখিলবন্ধু নাতির কাঁধে হাত রাখলেন। দেখে খুশি হলেন, ছেলেটা বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। বয়স হলে তাঁর মাথার সমান হবে। যে রকম বাড় দেখা যায়, তাতে তাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে। বাচ্চু যে তার মার মত ছোটখাট হবে না, অখিলবন্ধুর বংশের ধারা পাবে, এ কথা ভাবতে তাঁর ভালো লাগল।

বাচ্চুর কাঁধে হাত রেখে অখিলবন্ধু তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোকে যারা ঠাট্টা করে তাদের বলিস যে, আমার দাদু তো আর দুধে জল মেশায় না যে গয়লা হবে। অখিল বিশ্বাসের হাত থেকে যারা দুধ নেয় তারা তাকে বন্ধু মনে করে, আত্মীয় মনে করে। সেইজন্যেই তাদের বাড়িতে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। নইলে এই ক'সের দুধ বিক্রি করে আমি কি মহারাজ হয়ে যাব? দামটা তারা জোর করে দেয় তাই নিতে হয়। আমার কাছ থেকে মাগনা দুধ তারা নেবেই বা কেন?'

অখিলবন্ধু আস্তে আস্তে শহরের দিকে এগোতে থাকেন। বেশি দূর তো যান না। কাছাকাছি যাঁরা থাকেন তাঁদের বাড়িতেই দুধের যোগান দেন অখিলবন্ধু। এই নিয়ে নলিনীর সঙ্গে তাঁর বহুদিন বহু ঝগড়া হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, 'তুমি কেন নিজের হাতে দুধের বালতি বয়ে বেড়াবে? তুমি না ভদ্দরলোকের ছেলে?' অখিলবন্ধু হেসে জবাব দিয়েছেন, 'তোমার বাবার তো সেই বিশ্বাসই ছিল। তুমিই কেবল সে কথা মানতে চাও না।'

প্রথম প্রথম মাসকয়েক একজন লোকই রেখেছিলেন অখিল-বন্ধু। বলাই গরু দুটিকে ঘাসজল দিত, দুধের বালতিও সেই বয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে জোগান দিয়ে আসত। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই তার চুরি ধরা পড়তে লাগল। বলাই দুধে জল মিশিয়ে অখিলবন্ধুকেও ঠকায়, তাঁর খদ্দের বন্ধুদেরও ঠকায়। একদিন ডাক্তার বিমল দাস তাঁকে ডেকে বললেন, 'অখিলবাবু, কিছু মনে করবেন না, আপনি এত সৎলোক, এত ভালো মানুষ, কিন্তু আপনার দুগ্ধবতী গাভীটি বড় অসতী।'

অখিলবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন, কেন?'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'সে বোধ হয় দুই বানে দুধ দেয়, দুই বানে জল। একেবারে আধাআধি বরাদ্দ।'

অভিযোগটা অন্য খদ্দেরের কাছ থেকেও আসতে শুরু করে-ছিল। অবশ্য এতো সরস ভাষায় নয়। অখিলবন্ধু লজ্জিত হলেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন কীর্তিটা বলাইয়ের। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছাড়িয়ে দিলেন কাজ থেকে। সেই থেকে তিনি দুধ যোগাবার জন্যে আলাদা লোক আর রাখেননি।

ভদ্রলোক হয়ে দুধের বালতি হাতে নিয়ে বেরোন বলে পাড়ায় অখিলবন্ধুকে কেউ বলে কৃপণ, কেউ বলে বাতিকগ্রস্ত। অখিলবন্ধু, তাতে কান দেন না। কিন্তু ডাক্তারের একটা কথা তাঁর মনে আজও গাঁথা হয়ে আছে।

তাঁকে নিজের হাতে দুধের বালতি নিয়ে আসতে দেখে ডাক্তার ভদ্রলোক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ছি ছি অখিলবাবু, বালতিটা তাই বলে আপনি কেন নিজে বয়ে আনতে গেলেন? বুড়ো মানুষ কষ্ট হয়তো আপনার। আপনি আর কাউকে ঠিক

করে নিন। একটু চোখে চোখে রাখলেই আর জল মেশাতে পারবে না।'

অখিলবাবু সে অনুরোধ রাখেননি। পরদিন এসে হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কাল দুধ কেমন খেলেন ?'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'চমৎকার, দুধ তো নয় অমৃত। ভোর-বেলায় আপনাকে এই দুধের বালতি হাতে আসতে দেখে আমার কি মনে হয়েছিল জানেন ? যেন এক Apostle অমৃতের ভাণ্ডার হাতে নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।'

অখিলবন্ধু জিভ কেটে বলেছিলেন, 'ছি ছি ছি, কাকে কি বলছেন ? আমি সামান্য মানুষ। নিজের ক্ষেত খামারে চাষ-আবাদ করি। কার সঙ্গে কার তুলনা।'

বিমলবাবু বলেছিলেন, 'এই মানব জমিনে আপনি সেরা চাষী বিশ্বাসমশাই। জানেন, এই দুধ শিশুরা খায়, রোগীরা খায়। কিন্তু এমনই মানুষের লোভ যে সেই শিশুর খাদ্যে বিষ মেশাতেও তাদের হাত কাঁপে না। পথ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে পাবেন না। আমরা আবার আমাদের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে গর্ব করি।'

এতগুলি কথার মধ্যে একটি কথাই বিশেষ করে অখিলবন্ধুর মনে গেঁথে রয়েছে। Apostle-এর হাতে অমৃতের ভাণ্ড। তাই কি আর হতে পারে। ক্রাইস্টের প্রধান বারজন শিষ্যের মধ্যে অখিলবন্ধু কি আর কোন একজনের তুল্য হতে পারেন ? তবে ইচ্ছা করলে প্রতিবেশীদের কাছে কয়েক সের খাঁটি দুধ বিক্রি করা, তাঁদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা, হেসে কথা বলা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। অখিলবন্ধুর স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। নলিনী কথায় কথায় ছড়া

বলতেন ভালো ভালো, ঠিক জায়গা মত খাটাতে পারতেন। তিনি বলতেন, 'কথায় মধু, কথায় বিষ। মুখের কথায় মনের হদিস।'

দুধারে বাগান বাঁশঝাড়। মাঝখানে সরু একটু রাস্তা। সেই রাস্তাটুকু হেঁটে এসে যশোর রোডে পড়লেন অখিলবন্ধু। অল্প স্বল্প বাস আর লরি চলাচল আরম্ভ হয়েছে। সাবধানে বড় রাস্তা পার হলেন। ইঁটখোলা আর শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে ডাক্তার বিমল দাসের বাড়িতে এসে উঠলেন অখিলবন্ধু। বছর পঞ্চাশেক বয়স হয়েছে বিমলবাবুর। চুলটাই একটু যা বেশি পেকেছে। আর কোন দিকে বয়সের ছাপ তেমন টের পাওয়া যায় না। বেঁটে খাট চেহারা। এখনও বেশ শক্ত সমর্থ শরীর। মুখখানা হাসিখুশি। খোলা বারান্দায় খোলা গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিমলবাবু। অখিলবাবুকে ডেকে বললেন, 'এ কি, আপনি আজও ওই দুধের বালতিটা টানতে টানতে নিয়ে এসেছেন? না না, এ বড় অন্যায় আপনার।'

অখিলবন্ধু হেসে বললেন, 'কেন, অন্যায় কিসের? ভেবেছেন শোকে দুঃখে আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি? বালতি বইবার শক্তি আর আমার নেই?'

বিমলবাবু বললেন, 'তা ঠিক নয়। দুঃখ আঘাত কিছুই আপনাকে কাতর করতে পারে না। এতকাল ধরেই তো দেখে আসছি। কিন্তু বয়সও তো হল। তাছাড়া স্বাস্থ্যও তো তেমন ভালো না আপনার।'

অখিলবন্ধু প্রতিবাদ করে বললেন, 'না ডাক্তারবাবু, আমাকে এমন রোগা দেখালে কি হবে, আসলে আমি রোগী নই। বলুন তো, আপনার পেশেন্টের মত আমি কি অত ভুগেছি?'

বিমলবাবু চুপ করে রইলেন। অখিলবন্ধুর স্ত্রীর চিকিৎসা তিনি করেছেন। হার্ট-ডিজিজে বহুদিন ধরেই ভুগছিলেন নলিনী সে কথা ঠিক। বড়ই খামখেয়ালী ছিলেন মহিলা। কারো কোন পরামর্শ কানে তুলতেন না। না ডাক্তারের, না স্বামীর। বেশি কড়াকড়ি করলে বলতেন, 'ডাক্তারবাবু, অনেককাল বাঁচলুম, আর বাঁচবার সাধ নেই।'

অবশ্য সংসারের জন্য যেভাবে পরিশ্রম করতেন তাতে জীবনের ওপর তাঁর কোন বীতস্পৃহার পরিচয় পাওয়া যেত না। শুধু ঘরকন্না নয়, ক্ষেত-খামার গরু-বাছুর সব কিছুর জন্যেই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে খাটতেন ভদ্রমহিলা। অখিলবন্ধুর নিষেধ শুনতেন না। তাঁর স্বাস্থ্যের কথা শুনলে বলতেন, 'থাক, আমার আর অত দরদে কাজ নেই।'

শুধু তাই নয়, দুপুরবেলায় একটা স্কুলও চালাতেন ভদ্রমহিলা। পাড়ার ছোট ছোট গরীব ছেলে-মেয়েদের জুটিয়ে এনে তাদের লেখাপড়া শেখাতেন। বই শ্লেট প্রথম প্রথম তিনিই নিজের টাকা খরচ করে কিনে দিতেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেলে, খুব যারা গরীব, শুধু তাদেরই বই জোগাতেন নলিনী। টিচার হিসাবে বেশ সুনামও হয়েছিল তাঁর।

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্কুলটার কী করবেন অখিলবাবু?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'স্কুল! স্কুলটা যেমন করে পারি চালাব বিমলবাবু। তাঁর স্মৃতি আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না।'

স্মৃতি শুধু অখিলবন্ধুর স্ত্রীর নয়, ছেলেরও। ছেলে অতুলের নামেই এই স্কুলের নাম রেখেছেন নলিনী। ছোট ঘরখানার মাথায় আজও টিনের সাইনবোর্ড ঝুলছে, 'অতুল শিশু-শিক্ষা সদন'।

কিন্তু কথাটা অখিলবন্ধুকে আর মনে করিয়ে দিলেন না বিমলবাবু। ছ' বছর আগে বাস-এ্যাক্সিডেণ্টে মৃত্যু হয়েছে অতুলের। এই যশোর রোডের ওপরই সেই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিমলবাবুই গাড়িতে করে অতুলকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলেন। জীবনে যথেষ্ট শোক পেয়েছেন অখিলবন্ধু। তবু মাথা ঠিক রেখেছেন, তবু ভেঙে পড়েন নি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ঠিক আগের মতই বজায় রেখেছেন। নিজের কাজকর্ম যথাক্রমে করে যাচ্ছেন। মানুষটিকে দেখে বিমলবাবুর শ্রদ্ধা হয়। তিনি যে কখনো অখিলবন্ধুকে এন্‌জেল্‌, কখনো এপসোল বলেন, তা তাঁর মুখের স্তুতি নয়, অন্তরের বিশ্বাস।

অখিলবন্ধুর দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তিনি অন্দরের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে এসে ডাকলেন, 'কই মা লক্ষ্মী, পাত্রটা দিন, দুধ রাখুন আপনাদের।'

ঘরের ভিতর থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মহিলা বেরিয়ে এসে স্মিতমুখে বললেন, 'এই যে বিশ্বাসমশাই। খাওয়া নিয়ে ছেলে-মেয়ে কোঁদল করছিল। ওদের জ্বালায় কি বাইরের কিছু শোনবার জো আছে?'

তারপর তার স্বামীর মতই অখিলবন্ধুকে অনুযোগ দিয়ে বললেন, 'কেন আপনি কষ্ট করে বালতিটা টেনে নিয়ে আসেন বলুন তো। বড় খারাপ লাগে। আপনি বরং বাড়িতেই রেখে দেবেন দুধ। আমাদের ফটিক গিয়ে নিয়ে আসবে।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'তা হলে মা লক্ষ্মী আপনাদের সঙ্গে যেটুকু দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তবু তো এই উপলক্ষে আপনাদের খোঁজ-খবর নিয়ে যেতে পারি।'

বঙ্কিম-বাবুর স্ত্রী ইন্দিরা একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তা নেবেন বৈকি। ভোরে উঠে আপনার মত মানুষের সঙ্গে যে [illegible] দেখা হয় সে আমাদের সৌভাগ্য। আপনার কষ্টের কথা ভেবেই বলছিলাম।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'মাসীমা তো চলে গেলেন। এবার বাচ্চুর কী ব্যবস্থা করবেন?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'ব্যবস্থার আর কী আছে বলুন। ভগবান ওকে অনাথ করেছেন, ভগবানই ওকে দেখবেন।'

ইন্দিরা বললেন, কিন্তু আপনি কি ওকে একা সামলাতে পারবেন? নাকি কিছুদিনের জন্যে ওকে ওর মা-র কাছে—'

অখিলবন্ধু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না না, কখনো না। দয়া করে আপনারা তার নাম আর কেউ মুখে আনবেন না।'

বরাদ্দ দুধটুকু রেখে বালতি হাতে নিয়ে ফের চলতে শুরু করলেন অখিলবন্ধু।

তিন

দিন দুই পরে অখিলবন্ধু বাচ্চুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বল তো, নলিনী-অতুল শিক্ষাসদন কথাটা ভালো শোনায়, না অতুলের নামটা আগে দিয়ে অতুল-নলিনী শিক্ষাসদন কথাটাই কানে বেশি ভালো লাগে ?'

বাচ্চু ছুরি দিয়ে কাঁচা আম কেটে কেটে খাচ্ছিল। অখিলবন্ধুর দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করল, 'অতুল-নলিনী, নলিনী-অতুল। দাদু, অতুল-নলিনীই ভালো। মেয়েদের নামটা পরে দিলেই ভালো শোনায়।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'ঠিক বলেছিস, আমার কানেও অতুল-নলিনীই ভালো লেগেছে। সেইভাবেই সাইনবোর্ড করিয়ে এনেছি। তোর ঠাকুরমার নামটা স্কুলের সঙ্গে গাঁথা হয়ে থাক। সেই তো নিজের হাতে সব করেছে। আয়, দুজনে মিলে সাইনবোর্ডটা স্কুলের গায়ে এবার এঁটে দিই। ছুটে যা। ছোট মইখানা নিয়ে আয় তো।'

পূবের ভিটেতে ছোট একখানা খড়ের ঘর। চারদিকে বাখারির বেড়া। ভিতটা মাটির। নলিনীর ইচ্ছা ছিল পাকা করে নেবেন। তা আর হয়ে ওঠেনি। তবে সপ্তাহে একবার করে নিজের হাতে নিকোতেন। যেন চার্চের মতই পবিত্র এই ঘর। স্বামীকে মুখে বলতেনও সে কথা। 'আমার স্কুলটাকে অবহেলা কোরোনা। আমি যদি মরে যাই, আমার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটাকে যেন কবর দিয়ো না। ওকে মাটির উপরই খাড়া করে রেখ।'

অখিলবন্ধু স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, 'কী যে বল। তোমার স্কুল যাবে কোথায়। ও স্কুল দাঁড়িয়ে গেছে।

অখিলবন্ধু অবশ্য জানতেন একে দাঁড়ানো বলেনা। বিনে মাইনের স্কুল, যাদের মাইনে দিয়ে পড়াবার ক্ষমতা নেই তারাই খেয়ালখুশি মত ছেলে পাঠায়। একটা জায়গায় বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলি আটকা থাকে, রাস্তায় কি ঝোপে-জঙ্গলে টো-টো করে বেড়াতে পারেনা—এই উপকারটুকুই গরীব অভিভাবকদের পক্ষে যথেষ্ট। নলিনী কিন্তু তা মনে করতেন না। তিনি একে পুরোপুরি স্কুল বলেই ভাবতেন। বিনে মাইনের ছাত্রছাত্রী বলে তাদের অবজ্ঞা করতেন না, ফাঁকি দিতেন না। খেটে পড়াতেন। মিশনারি স্কুলগুলির মতই সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা নিতেন। পুরস্কার বিতরণ, বার্ষিক উৎসব কিছুই বাদ যেত না।

অখিলবন্ধু স্ত্রীর কথা ভেবে মৃদু নিঃশ্বাস ফেললেন। খিটখিটে বদমেজাজী হলেও অনেক গুণ ছিল নলিনীর।

বাচ্চু মইটা এনে স্কুলের বেড়ার গায়ে লাগিয়ে দিল। অখিল-বন্ধু নতুন সাইনবোর্ডখানা হাতে মই-বেয়ে উঠতে যাচ্ছে, বাচ্চু দাদুর হাতখানা টেনে রাখল, 'উঠোনা দাদু, উঠোনা, তুমি পড়ে যাবে।'

অখিলবন্ধু হেসে বললেন, 'আরে না না, পড়ব কেন। তুই ছেড়ে দে আমাকে।'

বাচ্চু এবার সুযোগ পেয়েছে বলবার, দাদুকে শাসন করবার। সে গম্ভীর মুখে বলল, 'বলছি যে পড়ে যাবে। বুড়ো মানুষ, হাড়-গোড় ভেঙে হাঁটু-ভাঙা দ হয়ে থাকবে। মরেও যেতে পার। তাহলে তিনটে নাম কিন্তু এই একখানা সাইনবোর্ডে ধরবে না দাদু।'

হাসতে গিয়ে গভীর আবেগে চোখে জল এল অখিলবন্ধুর।

পৌত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে পরম স্নেহে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার নামটা বাদ দিস ভাই। আমার নাম আর তোকে ধরাতে হবে না।'

অখিলবন্ধু বাঁশের মইখানা ধরে রইলেন। বাচ্চু তা বেয়ে তরতর করে উঠে গেল। পুরোন সাইনবোর্ডখানা খুলে ফেলে নতুন বোর্ডখানা তার জায়গায় লাগাতে লাগল।

অখিলবন্ধু সেইদিকে অপলকে তাকিয়ে নিজের মনে বলতে লাগলেন, 'নলিনী, আমি যে তোমার নামে ছোটখাট একটা মনুমেণ্ট খাড়া করতে না পারতাম তা নয়। কয়েক বিঘা জমি ছেড়ে দিলেই তা হত। এখন তো জমির অনেক দাম। কিন্তু কী হবে একটা ইট-সুরকির পাঁজা খাড়া করে। তার চেয়ে তোমার হাতের গড়া স্কুলটা যদি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি তা ঢের ভালো হবে। গরীব ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়বে। মাঝে মাঝে তোমার কথা তারা শুনবে। তোমাকে যেমন তোমার ছেলের কাছে শুইয়ে রেখে এসেছি, তেমনি তোমার নামটাও তোমার ছেলের নামের সঙ্গে গেঁথে রাখলাম। এ গিঁট আর কোনদিন খুলবেনা।'

বাচ্চু সাইনবোর্ডটা লাগাতে লাগাতে বলল, 'দেখতো দাদু, ঠিক আছে কিনা। না বেঁকে-টেকে গেছে।'

অখিলবন্ধু একবার ডানদিক থেকে আর একবার বাঁ দিক থেকে বোর্ডটা লক্ষ্য করে নিয়ে বললেন, 'বেঁকে যায়নি। ঠিকই আছে। আয়, তুই এবার নেবে আয়।'

কিন্তু দাদুর কথার দিকে বাচ্চুর কান ছিলনা। তার চোখ গিয়ে পড়েছিল সামনে। আমবাগানের ছায়া-ঢাকা সরু পথটুকু দিয়ে

ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে যে এগিয়ে আসছে, তাকে কাল রাত্রেও স্বপ্ন দেখেছে বাচ্চু। সে স্বপ্ন আজই যে সত্যি হবে, তা সে ভাবতে পারেনি। একটা একটা করে ধাপ বেয়ে নেমে আসবার আর ধৈর্য রইলনা বাচ্চুর, কয়েক হাত উঁচু থেকে সে লাফিয়ে পড়ল। আর মাটিতে পড়েই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ইভাকে, 'মা, তুমি সত্যিই এলে? তুমি আমার চিঠি তাহলে পেয়েছ?'

ইভা ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'পেয়েছি। তুই তো ভারি রোগা হয়ে গেছিস বাচ্চু।'

অখিলবন্ধু দূর থেকে নাতি আর পুত্রবধূর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কিসের একটা ঈর্ষায় বুকের ভিতরটা তাঁর জ্বলে যেতে লাগল।

দেখতে ইভাকে বেশ সুশ্রীই বলা যায়। গায়ের রঙ গৌর, একটু লম্বাটে ধরনের সুডৌল মুখ। দোহারা গড়ন। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর হবে। কিন্তু চেহারায় সেই বয়সের ছাপ এখনো তেমনভাবে পড়েনি। বরং বয়সের অনুপাতে শরীরের গড়ন এবং স্বাস্থ্য তার বেশ ভালোই আছে বলে মনে হয়। কালো পেড়ে সাদা-খোলের তাঁতের শাড়িই আজ পরে এসেছে ইভা। গয়নাও খুব পরিমিত। হার-চুড়ি, হাতে একটি ছোট ঘড়ি আর একটি বটুয়ার মত ভ্যানিটি ব্যাগ। তার রঙও কালো। কোথায় কোন্ পোষাকে আসতে হয় ইভা তা জানে। যে বাড়ির গৃহিণী তিন-চারদিন আগে মারা গেছেন, আর বিশেষ করে যে ভদ্রমহিলা এক সময় তার শাশুড়ী ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যে এখানে জমকালো শাড়ি-গয়না পরে আসা যায় না, সে বোধ ইভার খুব ভালোই আছে। তাই তার শাড়ির পাড়ের রঙ কালো, ব্যাগের রঙ কালো।

কিন্তু তাই বলে ঠোঁটে আলতো করে লিপস্টিক লাগাতে ইভা আজও ভোলেনি, মুখে পাউডারের পাফ ঠিকই বুলিয়েছে। মাথায় আঁচল দেয়নি, দেহের গড়ন যাতে আঁটসাট দেখায় তার জন্যে চেষ্টার ক্রুটি নেই। বেশবাসে যত সৌম্য, যত সাত্ত্বিকতার ভানই করুক, ওর ভিতরের ভোগস্পৃহা যাবে কোথায়? অখিলবন্ধুর বুকের ভিতরটা জ্বলে যেতে লাগল। ইচ্ছা হল চেঁচিয়ে বলেন, 'তুমি কেন এলে? কেন এলে? নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েমানুষ! ফের এ বাড়িতে পা দিতে তোমার লজ্জা হয় না?'

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেন না অখিলবন্ধু। মনের রাগ মনেই চেপে রেখে কয়েক পা এগিয়ে এসে ইভার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও, ওর কাজ আছে।'

ইভা পূর্বতন শ্বশুরের এ আদেশ অমান্য করল না। ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে একটু এগিয়ে এসে নিচু হয়ে অখিলবন্ধুর পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্যে হাত বাড়াতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে দু-পা পিছিয়ে গেলেন। বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক থাক, ওসবে আর দরকার নেই।'

ইভা প্রণাম করবার জন্যে আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করলনা। বরং মাথা নিচু করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তারপর বেশ অনুযোগের সুরে বলল, 'এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আমাকে খবরটাও দিলেন না?'

অখিলবন্ধু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'খবর দিয়ে কী হবে?'

ইভা বলল, 'অন্তত চোখের দেখাটা তো একবার দেখতে পারতাম।'

অখিলবন্ধু নিষ্ঠুরভাবে বললেন, 'সে তা চায়নি। তাতে তার

মনে আরো অশান্তি হত। তোমাকে যতবার দেখেছে, তার জ্বালা বেড়েছে ছাড়া কমেনি।'

অপমানে ইভার চোখে জল আসবার যো হল। কিন্তু জল সে আসতে দিল না। প্রাণপণ চেষ্টায় সে উদ্‌গত অশ্রুকে রোধ করল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইল একটুকাল, তারপরে গলায় প্রচ্ছন্ন একটু শ্লেষ মিশিয়ে সংক্ষেপে বলল, 'তাহলে ভালোই করেছেন।'

খোঁচাটা অখিলবন্ধুর সহ্য হল না। তিনি বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই ভালো করেছি। কেন তুমি ফের আস? আসতে লজ্জা করেনা তোমার? কোন্ অধিকার আর তোমার আছে এখানে?'

ইভা যেন সমস্ত লজ্জা সংকোচ শঙ্কা ভীতির বাইরে চলে এসেছে। অখিলবন্ধুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ় স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল, 'অধিকার আছে বলেই এসেছি। না থাকলে আসতাম না। চল বাচ্চু, ঘরে গিয়ে সব বলব।'

ছেলের হাত ধরে ইভা সত্যিই বারন্দা পেরিয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। উত্তরের ভিটেতে এই পাকা বাড়ি যখন তৈরী করেন অখিলবন্ধু তখন অতুল ছিল বেঁচে। তার শোবার ঘর ছিল, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বসবার ঘর ছিল আলাদা। খাবার ঘরেও মাসের মধ্যে অন্তত পাঁচ সাত দিন সে বন্ধুদের নিয়েই ঢুকত। অখিলবন্ধু আশা করেছিলেন, একতলায় যেমন চারখানা ঘর তুলেছেন দোতলাতেও তেমনি ঘর তুলবেন। সব আশা, সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়ে অতুল চলে গেছে। ভেবেছিলেন নাতি আর পুত্রবধূকে নিয়ে জীবনের বাকি কটা দিন শান্তিতে কাটিয়ে যেতে পারবেন, ইভা তাও হতে দিল না। অতুলের ছুটো ডেথ এ্যানিভারসারি হতে না হতেই তার বন্ধুকে নিয়ে পালাল। ছেলেকে

ফেলে রেখে দ্বিতীয়বার বিয়ে করল। করেছে বেশ করেছে। কিন্তু অখিলবন্ধুকে কেন সে তার পরেও জ্বালাতে আসে? ওকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হিংসার ঝড় ওঠে, বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে। অখিলবন্ধু তো তা চান না। তিনি শান্তিতে থাকতে চান। সত্যিকারের খ্রীষ্টানের মত অহিংস হয়ে দ্বেষ বর্জন করে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চান তিনি। কিন্তু এই সংসার বড় জটিল। যারা সোজাপথে হাঁটতে চায় তাদের জন্যেও সে গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। আশ্চর্য, এত কাণ্ডের পরেও ইভা অখিলবন্ধুর বাড়িতে আসে, নিঃসংকোচে ঘরের মধ্যে ঢোকে—যে ঘরের মায়াডোর মমতার বন্ধন সে নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

অখিলবন্ধু আর এগালেন না। যেখানে ছিলেন সেখানেই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের মনেই বললেন, 'আশ্চর্য, অনেক দেখেছি কিন্তু এমন নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েমানুষ আমি আর জন্মে দেখিনি।'

রতন মণ্ডল আর গোবিন্দ দাস অখিলবন্ধুর খামারে কাজ করে। অখিলবন্ধু রোজকার মজুরী তাদের রোজ দিয়ে দেন। পুজো পার্বনের সময় একখানা করে কাপড় আর গামছা গেঞ্জিও দিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও সিকিটা আধুলিটা তারা চেয়ে চিন্তে নেয়।

তারা অখিলবন্ধুর বাগান সাফ করতে এসেছিল। রতনের বয়স বত্রিশ, গোবিন্দর কিছু কম।

রতন অখিলবন্ধুর কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'কর্তাবাবু, ছেড়ে দিন। আপনি ওনার সঙ্গে পারবেন না। হাজার হলেও মেয়েছেলে তো? কী করবেন আপনি। চলুন, বাগানে চলুন, কাজকর্ম করি গিয়ে।'

রতন আর গোবিন্দকে কাজ দেখিয়ে দিয়ে অখিলবন্ধু সোজা দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চললেন। অতুল আর নলিনীকে যেখানে পাশাপাশি কবর দিয়েছেন সেখানে এসে দাঁড়ালেন। অতুলের কবরের উপর শ্বেত পাথরের স্মৃতিফলক এরই মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু নলিনীর স্মৃতির মতই তার ফলকের শুভ্রতা এখনো অম্লান। আজও ভোরে এসে এখানে ফুল দিয়ে গেছেন অখিলবন্ধু। নিজের বাগানের ফুল, কোথায় অতুল তার সমাধিতে ফুল দেবে, তা নয় তো তিনিই ফুল জোগাচ্ছেন।

অখিলবন্ধু স্ত্রীর কবরের পাশে এসে বসে পড়লেন। স্ত্রী বেঁচে থাকতে যেমন যখন-তখন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতেন, তেমনি বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহা ফ্যাঁসাদে পড়লাম যে, বলতো কী করি?'

চার

ঘরে গিয়ে ইভা ছেলের কাছ থেকে সব শুনতে লাগল। বাচ্চুর ঠাকুরমার যখন খুব অসুখ তখন কেন ইভাকে ওঁরা কেউ খবর দিলেন না। বেশি আপত্তি ছিল কার? বাচ্চুর ঠাকুরদার না ঠাকুরমার? ইভা খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করে সব জেনে নিল।

'তা হলে তোর দাদুই সব চেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিলেন, কী বলিস?'

'হ্যাঁ মা, আমি সেদিন লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে চিঠি লিখলাম, তাই তুমি সব জানতে পারলে। নাহলে তুমি কিছু জানতেও না, এখানে আসতেও না।'

ইভা ছেলেকে কাছে টেনে একটু আদর করে বলল, 'ঠিক বলেছিস। আমি জানি, তুই আমাকে চিরকাল ভালোবাসবি, যখন যা হয় জানাবি, আমি তোর ভরসাতে আছি বাচ্চু।'

বাচ্চুর একবার ইচ্ছে হল বলে, 'তাহলে তুমি আর একজনকে বিয়ে করে চলে গেলে কেন? কেন আমাদের বাড়িতে রইলেনা? তাহলে রোজ তোমাকে আমি দেখতে পেতাম, রোজ আমি তোমার আদর পেতাম।'

কিন্তু কথাগুলি মনে এলেও মুখ ফুটে বলল না বাচ্চু। এসব কথা বললে মার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে যাবে। মা হয়তো এখানে আর কোনদিন আসবেনা। ঠাকুরমা তো এই খোঁটাই তার মাকে দিত। আর সেইজন্যেই বাচ্চুর মা তাকে কোনদিন ভালোবাসত না।

বাচ্চুর দাদুকেও তার মা দেখতে পারে না। কারণ দাদুও বড় বকাবকি করেন। বাচ্চুর মা এ-বাড়িতে শুধু তাকেই ভালোবাসে কারণ বাচ্চু মনের কথা সব চেপে রাখে। মা যাতে দুঃখ পাবে, যাতে তার কষ্ট হবে, তা সে কখনো বলেনা। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা আর মাকে দেখে বাচ্চুর এই বুদ্ধিটুকু হয়েছে যে, মনের সব কথা মুখে বলতে নেই, তাহলে আপনজনের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক থাকে না।

বাচ্চু ইভাকে বরং অন্য কথা বলল। বলল, 'মা, ওদের কেন নিয়ে এলেনা?'

'কাদের?'

বাচ্চু বলল, 'রন্তু আর বুলাকে? আর তাদের বাবাকে?'

ইভা একটু লজ্জিত হল কিন্তু ছেলেকে শুধরে দিয়ে বলল, 'ছিঃ বাচ্চু, তাদের বাবা তাদের বাবা কোরোনা?'

বাচ্চু বলল, 'তাহলে কী বলে ডাকব?'

'ওরা যা বলে। বাবু বলবে।'

মা এ-কথা আগেও কয়েকদিন বলে দিয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা বাচ্চুর পছন্দ হয়নি। সে-কথা চেপে গিয়ে বলল, 'ওদের কেন নিয়ে এলে না?'

ইভা বলল, 'তিনি আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েই চলে গেলেন। এরোড্রোমের প্যাসেঞ্জার পেলেন তাই।'

বাচ্চু বলল, 'মা, আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই, ওঁর ট্যাক্সিতে উঠতে পারব?'

ইভা বলল, 'কেন পারবেনা? ছেলেপুলে উনি খুব ভালো-বাসেন। তোমাকেও ভালোবাসবেন। তুমি যদি তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা

করো, তিনিও তোমাকে খুব আদর করবেন। দুনিয়ার এই নিয়ম, দিলেই পাওয়া যায়। তোমার দাদু যদি ওঁকে স্নেহ করতেন, খোঁজ-খবর করতেন, তাহলে তিনিও বাপের মতই দেখতেন। তোমার বাবুরও বাপ-মা নেই, আমার বাবা-মাও ছেলেবেলায় মারা গেছেন। আমাদেরও দুজনেরই বাবা হতে পারতেন তোমার দাদু। কিন্তু ওঁর নিজের স্বভাবের দোষে উনি সব হারাচ্ছেন।'

কিন্তু শেষ কথাগুলি বাচ্চুর কানে গেল না। তার চোখের সামনে একটি ধাবন্ত ট্যাক্সি। আর সে বসে আছে ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভার হল রন্তু আর বুলার বাবা। তিনি যদি ট্যাক্সিতে উঠতে দেন তাহলে তাঁকে আর কাকাবাবু নয়, শুধু বাবু বলতেও বাচ্চু রাজী আছে।

বাচ্চু বলল, 'মা, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে? ক'দিন পরেই তো আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে। এ ক'দিন পড়াশুনো আর তেমন হবে না। যাবে তুমি আমাকে নিয়ে?'

ইভা একটু হেসে বলল, 'সেইজন্যেই তো এসেছি। এখন তোর দাদু তোকে যেতে দিলে হয়।'

বাচ্চু বলল, 'ঈস, যেতে না দিলেই হল। যেতে না দিলে দাদুর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে। তুমি যদি সঙ্গে থাকো, তুমি যদি আমার পক্ষে থাকো মা, কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার আর ভয় নেই।

ইভা স্মিতমুখে বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে আর বীরত্ব ফলাতে হবে না। দেখি চেষ্টা করে কতদূর কি করতে পারি।'

পোষাকি শাড়ি ছেড়ে আটপৌরে শাড়ি পরল ইভা। তারপর রান্না-বান্নার ব্যবস্থায় লেগে গেল। এ বাড়ির কোথায় কি আছে তা

তার জানা। একটানা দশ বছর সে এই বাড়িতে ঘর-সংসার করেছে। যদিও শাশুড়ী সম্পূর্ণ ভার তার হাতে ভরসা করে কোনদিন ছেড়ে দেননি, নিজের কর্তৃত্ব আর আধিপত্য সব সময় বজায় রাখতে চেয়েছেন, তাহলেও অনেক দায়িত্বই আস্তে আস্তে ইভার ওপর এসে পড়েছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হবার পর এ সংসারের সবই ইভার কাছে শূন্য হয়ে গেল। শাশুড়ী আরো দায়িত্ব, আরো কাজ তার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলেন কিন্তু ইভার আর মন বসল না। তারপর অতুলের বন্ধু প্রভাত ভার নিল তার মনের এই শূন্যতা দূর করবার। কাজকর্মে আবার উৎসাহ, জীবনের ওপর নতুন স্পৃহা প্রভাতই এনে দিয়েছিল তাকে। এই নিয়ে কত কাণ্ডই না হল শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে! বিবাদ-বিসংবাদ ঝগড়া-ঝাঁটি মন-কষাকষি যখন চরমে উঠল, তখন মরীয়া হয়ে প্রভাতের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করল ইভা। না করে তার উপায় ছিল না।

ঘরে এসে অখিলবন্ধু ইভাকে সংসারের কাজকর্ম করতে দেখে মুহূর্তের জন্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে প্রথমে এমন একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল যেন তাঁর সংসার ঠিক আগের মতই আছে। স্ত্রী ছেলে সবই রয়েছে। আর তাঁর নিজের পছন্দ করে আনা আদরের পুত্রবধূ তাঁর ঘর-বাড়ি আলো করে রয়েছে। কিন্তু তাঁর এই সুখ-স্মৃতি মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। বাচ্চু বলল, 'দেখ দাদু, মা কি চমৎকার ডিমের কারি রান্না করেছে। ঝোলের রঙ দেখেই বুঝতে পারছি চমৎকার হয়েছে রান্না। তোমার রান্না কিছুতেই মা'র মত হয় না। হয় ঝাল বেশি হয়ে যায়, না হয় নূনে কম পড়ে—'

অন্য কেউ হলে এই তুলনায় অখিলবন্ধু কৌতুকই বোধ করতেন। কিন্তু বাচ্চুর কথায় তিনি চটে উঠলেন। মনের ঝাল মেটাবার যেন নূতন সুযোগ পেয়ে গেলেন। বললেন, 'থাম থাম। তোর মায়ের গুণপনা আর জাহির করতে হবে না আমার কাছে' আমি সব জানি।' তারপর ইভার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে এসব ছুঁতে কে বলেছে? কে বলেছে আমার ঘরে এসে তোমাকে রান্নাবান্না করতে?'

ইভা শান্তভাবে বলল, 'বলবে আবার কে? দুপুর হতে চলল, রান্নাবান্না না করলে বাচ্চুই বা খাবে কি, আপনাকেই বা কি খেতে দেব?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'ঈস, আমাদের জন্যে ভেবে ভেবে তো তোমার চোখে ঘুম নেই। আমাদের রেঁধে খাওয়াবারই যদি তোমার ইচ্ছে থাকত, তাহলে এ সংসার থেকে চলে যেতে না।'

ইভা এবার স্থিরদৃষ্টিতে অখিলবন্ধুর দিকে তাকাল, কিন্তু তার চোখে যতটা জ্বালা প্রকাশ পেল মুখের কথায় ততটা বোঝা গেল না। ইভা আগের মতই অবিচল এবং নির্বিকারভাবে বলতে লাগল, 'দেখুন, পুরোন খোঁটা দিয়ে আর লাভ নেই। আপনি সে সব পুরোন কথা তুলে ছেলের সামনে আমাকে অপমান করে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। আর আমি যতক্ষণ সামনে আছি, আমার কর্তব্যও আমি করে যাব। আমার ছেলেমেয়েকে আমি রেঁধে-বেড়ে খাওয়াব। আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।'

অখিলবন্ধু আরো দু'পা এগিয়ে এলেন, তারপর তীব্র ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, 'বটে! এত তেজ হয়েছে তোমার? তুমি আমার বাড়িতে বসে আমাকে চোখ রাঙাবে? আমার অনুমতি না নিয়ে

আমার ঘরের জিনিষপত্র দিয়ে রান্না করবে? এত স্পর্ধা হয়েছে তোমার? আমি এক্ষুনি তোমার হাতের ভাত-তরকারী সব বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। দেখি তুমি কী করতে পার।'

ইভা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেশ তো, আপনি যদি ফেলে দিতে পারেন দিন।'

কিন্তু বাচ্চু ছুটে এসে দাদুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দাদু, কখনো তুমি তা পারবে না। আমার মা এতক্ষণ ধরে কত কষ্ট করে রান্না করেছে। তুমি সব নষ্ট করে দেবে, আর আমরা বুঝি সারাদিন না খেয়ে থাকব?'

ইভা সেই যে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সেখান থেকে এক পা-ও নড়ে এল না। তারপর ঠিক তেমনি শ্লেষভরা কণ্ঠে বলতে লাগল, 'ওঁকে ছেড়ে দে। ওঁর যা খুশি তাই করুন। উনি আবার সত্যিকারের ক্রিশ্চিয়ান বলে গর্ব করেন। এত দ্বেষ, এত হিংসা যার মনে, তিনিই আবার পাড়ার আর দশজনের কাছে সেইন্ট সেজে বেড়ান। সেইন্ট হওয়া অত সহজ নয়। পেটভরা অত হিংসা থাকলে তা হওয়া যায় না। কেন, কী দোষ করেছি আমি ওঁর কাছে? আমি যা করেছি আমাদের সমাজে তা কি আর কেউ করে না? ওঁর ছেলে বেঁচে থাকতে যদি আমি খারাপ কিছু করতাম, আমাকে উনি দোষ দিতে পারতেন। তা তো করিনি। আমরা যা করেছি, তা ধর্মও মেনে নিয়েছে, আইনও মেনে নিয়েছে। হিংসার জ্বালায় মানতে পারছেন না কেবল উনি। উনি যে ট্রু ক্রিশ্চিয়ান। ওঁকে তুই ছেড়ে দে বাচ্চু। ওঁর যা খুশি তাই করুন।'

অখিলবন্ধু দু হাতে মুখ ঢাকলেন। তারপর দ্রুত পায়ে সরে



গেলেন ইভার সামনে থেকে। এই মুখরা স্ত্রীলোকটির কথা তাঁর সহ্য হয় না। গায়ে বিছুটি ধরিয়ে দেয়। কিন্তু ওর কোন কোন কথার যাথার্থ্য অখিলবন্ধু অস্বীকারও করতে পারেন না। প্রতিবাদ করবার যুক্তি খুঁজে পান না তিনি। নলিনীর কোন যুক্তির বালাই ছিল না, মুখে যা আসত বলতে পারতেন। যাকে অপছন্দ করতেন প্রাণভরে তার নিন্দা করতেন, গলা ছেড়ে ঝগড়া করতেন তার সঙ্গে। কিন্তু অখিলবন্ধু তা পারেন না। বিচার বিবেচনা, সৎ ক্রিশ্চিয়ান হওয়ার দায়িত্ব তাঁর গলা চেপে ধরে। নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হন অখিলবন্ধু। নিজের কামলা কিষাণের কাছে লজ্জা, প্রতিবেশীদের কাছে লজ্জা। ছি ছি ছি, যে মেয়েটি একেবারে পর হয়ে চলে গেছে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে তিনি কোন্ আক্কেলে ঝগড়া করেন? আশেপাশে যাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালো মানুষ বলে ভালোবাসে, তারা বলবে কি? তাঁর সম্বন্ধে তাদের ধারণা কি বদলে যাবে না?

আমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে অখিলবন্ধু ভাবতে থাকেন। ইভার কথাগুলিকে তিনি একেবারে অসার বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। সত্যিই তো, অতুল বেঁচে থাকতে তো ইভা প্রভাসের সঙ্গে ব্যাভিচার করেনি। অতুল মারা যাওয়ার পরই স্বামীর বন্ধুকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। এতে তার বিশেষ কোন দোষ দেওয়া যায় না। অবশ্য অখিলবন্ধুর সংসারে থাকলে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বাচ্চুকে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করে তুললে তা আরো সুখের হত। চিরজীবনের মত ইভা অখিলবন্ধুর আপন হয়ে থাকত। কিন্তু তা হয়নি বলে, তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি বলে ইভাকে তিনি গালাগাল করবেন কোন্ অধিকারে? কোন্ যুক্তিতে

তিনি তাঁর হিংসাদ্বেষকে সমর্থন করবেন? ডাক্তার বিমলবাবুও তাঁকে এই কথাই বলেন। তিনিও ইভার ব্যবহারের নিন্দা করেন না। বিমলবাবুর স্ত্রী ইভার উদ্দেশ্যে যতই গালমন্দ করুন বিমলবাবু বলেন, 'অখিলবাবু, এক হিসাবে এটা ভালোই হয়েছে। আপনার পুত্রবধূ যে খারাপ পথে যাননি, লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যাভিচার করেননি, গর্ভপাত ঘটাননি, বরং আর এক ভদ্রলোককে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছেন, নতুন ছেলেমেয়ের মুখ দেখেছেন, তাদের মানুষ করে তুলছেন, এ ঘটনাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে নেবেন। ভেবে দেখুন, খারাপ ঘটনা ঘটতে পারত। তাহলে কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকত না। তা যে হয়নি সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকুন।'

সবই তো বোঝেন অখিলবন্ধু। যুক্তি দিয়ে বিচার করে ইভার অপরাধকে খুব গুরুতর বলে মনে করতে পারেন না। তার সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহারেরও কোন সঙ্গত কারণ নেই। একজন অনাত্মীয়া প্রতিবেশিনী অখিলবন্ধুর কাছে যে সৌজন্য শিষ্টাচারের দাবি করতে পারে, ইভার দাবি তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। কিন্তু সব বুঝেও স্থির থাকতে পারেন না অখিলবন্ধু। ইভাকে দেখলেই মন অশান্ত হয়ে ওঠে। ভিতরের যত বিদ্বেষ আর জ্বালা আগ্নেয়গিরির নিঃস্রবণের মত বেরিয়ে আসতে চায়।

পা টিপে টিপে বাচ্চ এল এগিয়ে। আলগোছে হাত রাখল পিঠে। তারপর আদরের সুরে বলল, 'দাদু, তুমি এখানে বসে আছ? আমি এদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। চল, চানটান করে খেয়ে নেবে।'



অখিলবন্ধু মাথা নেড়ে বললেন, 'তোমরা খাও গিয়ে। আমি আর এবেলা খাব না।'

বাচ্চু মায়ের শিখানো কথা মুখস্থ বলে গেল, 'তুমি না খেলে মাও খাবে না দাতু। তোমার বাড়িতে তুমি না খেয়ে থাকবে আর অন্য বাড়ির লোক এসে রেঁধেবেড়ে খেয়ে যাবে তা কি হয়? তুমি না খেলে মাও খাবে না, আমিও খাব না।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'তোর খেতে বাধা কি? তুই তো আর অন্য বাড়ির ছেলে না।'

কিন্তু বাচ্চু কোন নিষেধ শুনল না, কোন মান অভিমানের ধার ধারল না। দাতুর হাত ধরে জোর করেই বাড়ির ভিতরে টেনে নিয়ে চলল।

অখিলবন্ধু বললেন, 'আরে থাম থাম। পড়ে টড়ে যাব, বুড়ো বয়সে আমার হাত পা-টা ভেঙে দিবি নাকি?'

বাচ্চু হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ দাতু। তোমাকে হাঁটুভাঙা দ করে রাখব। বানান করতেও দ, দেখতেও দ। বেশ মজা হবে।'

খানিকক্ষণ বাদে চানটান সেরে অখিলবন্ধু নাতিকে পাশে নিয়ে খেতে বসলেন। ইভা নিজের হাতে পরিবেশন করতে লাগল। তু-একবার জিজ্ঞাসা করল, 'তরকারিটা কেমন হয়েছে বাবা? আর দেব আপনাকে?'

ইভার গলা কোমল শান্ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখে স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসি। এই মুহূর্তে তার মুখ দেখে কিছুতেই বুঝবার জো নেই খানিকক্ষণ আগে শ্বশুরের সঙ্গে তার দারুণ ঝগড়া হয়ে গেছে। তার ধরনধারন দেখে বুঝবার উপায় নেই যে সে আর এ পরিবারের কেউ নয়, অখিলবন্ধুর সঙ্গে তার আর কোন

সম্পর্ক নেই। সে অনাত্মীয়া, অন্য লোকের স্ত্রী, অন্য বাড়ির গৃহিণী।

ডিমের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে অখিলবন্ধু ভাবলেন, 'মেয়েরা এমনি হয় বটে। ওরা মায়াবিনীর জাত, জন্ম-অভিনেত্রী।'

খেতে খেতে অখিলবন্ধু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলে না কেন? ওদের আনলেই পারতে।'

প্রশ্নটা ইভা এই মুহূর্তে আশা করেনি। লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আর একদিন আনব।'

কিন্তু ফের বিরোধ শুরু হল বিকাল বেলায়। বাচ্চু বায়না ধরল সে মায়ের সঙ্গে যাবে।

অখিলবন্ধু বললেন, 'কক্ষনো না। তুমি এখন কিছুতেই যেতে পারবেনা।'

বাচ্চু বলল, 'কেন দাদু, আমি তো আর এ কদিন স্কুলে যাচ্ছিনে। দিন কয়েক পরে স্কুল তো বন্ধ হয়েই যাবে। ছুটির মাসটা আমি মার কাছে থাকব। ঠাকুরমা নেই। এখানে একা একা থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না।'

অখিলবন্ধু তেমনি দৃঢ়ভাবে বললেন, 'তোমার যদি একটুও আত্মসম্মান বোধ থাকত তাহলে তুমি আর ওখানে যেতে চাইতে না।

কথাটা ইভার ভালো লাগল না। এতক্ষণ সে চুপ করে সব সহ্য করে যাচ্ছিল। এবার ফোঁস করে উঠল, 'অতটুকু ছেলের আবার সম্মান-অসম্মান কি?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'ছেলে হোক বুড়ো হোক, মেয়ে হোক পুরুষ হোক, সম্মান বোধ সকলেরই থাকা উচিত। মান-সম্মানের বোধটা

এখন জন্মাবে না তো কখন জন্মাবে? ও কি আর কচি খোকাটি আছে?'

ইভা বলল, 'আমার সঙ্গে যাবে তাতে ওর অপমানটা কোথায়?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'সে কথা বুঝবার শক্তি তোমার নেই। কিন্তু আমার বংশের ছেলেকে তুমি সেখানে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।'

ইভা বলল, 'ও কি কেবল আপনার বংশের? আমার কেউ নয়? ওর ওপর আমার কোন অধিকারই নেই?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'না। ফের বিয়ে করবার পর তুমি সে অধিকার হারিয়েছ। এখন ও শুধু আমার বংশের ছেলে। এখন আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই। থাকতে পারেনা। তুমি চলে যাও ইভা। বাচ্চুকে আমি তোমার সঙ্গে যেতে দেব না। আমার কথা যদি না মানতে চাও কোর্টে যাও। মামলা কর, মোকদ্দমা কর, হাইকোর্ট কর, সুপ্রীমকোর্ট কর। তুমি তোমার দখলীস্বত্ব যেভাবে পার সাব্যস্ত করে নাও। কিন্তু আপোষে ওকে আমি কিছুতেই এক ডাইনীর হাতে ছেড়ে দেব না। আমাকে না মেরে ওকে তুমি আমার বাড়ির সীমানার বাইরে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না।'

ইভা উদ্ধতভাবে বলল, 'আচ্ছা, পারি কি না পারি দেখব।'

তাকে নিয়ে মা আর দাদুর এই বিবাদটা বাচ্চু গোড়ার দিকে বেশ উপভোগ করছিল। এতে নিজের কাছে নিজের দাম আরো বেড়ে যাচ্ছিল তার। লোকে দামী জিনিস নিয়েই কাড়াকাড়ি করে। বাচ্চুর যদি সত্যিই কোন দাম না থাকত তাহলে কি আর তাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে টানাটানি হত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাগ অব ওয়ারে দাছুকে জিতে যেতে দেখে বাচ্চুর মন নৈরাশ্যে ভরে গেল। তাহলে সে আর মার সঙ্গে যেতে পারবে না। মার স্বামী প্রভাতবাবুর ট্যাক্সিতে চড়ে সারা সহর টহল দিয়ে বেড়াবার কোন সুযোগ হবে না তার। প্রভাতবাবুর উপর কোন রাগ নেই বাচ্চুর। প্রথম প্রথম যদি বা কিছু ছিল এখন আর তেমন কোন বিদ্বেষবোধ নেই বাচ্চুর মনে। ঠাকুরমা বেঁচে থাকতে একবার প্রভাতবাবুর বাড়িতে সে গিয়েওছিল। তাকে খুব কান্নাকাটি করতে দেখে ঠাকুরমা দুদিনের জন্যে তাকে মার সঙ্গে যেতে দিতে রাজী হয়েছিলেন। মানিকতলার সেই ফ্ল্যাট বাড়িটার কথা এখনো বেশ মনে আছে বাচ্চুর। এত জায়গা নেই, জমি নেই, গাছপালা ফুল ফল কিচ্ছু নেই। পায়রার খোপের মত ছোট ছোট সব ঘর। আর ঘরভরা গিজ গিজ করে সব মানুষ। তবু জায়গাটা খুব ভাল লেগেছিল বাচ্চুর। রাস্তা দিয়ে নানা আকারের মোটর গাড়ি ছুটছে তো ছুটছেই। বাস যাচ্ছে ট্রাম যাচ্ছে। কত রকমের লোকজন। আর রাস্তার দুপাশে কত বড় বড় সব বাড়ি। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল বাচ্চু। প্রভাতবাবু ট্যাক্সি করে তাকে অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে চিড়িয়াখানার পশু জানোয়ারগুলির কথা বাচ্চু কোনদিন ভুলতে পারবেনা। দাছুর কাছে থাকলে সে সুযোগ কোনদিন পেতনা বাচ্চু। এখনো যদি বেড়ি ভেঙ্গে না বেরোতে পারে কোনদিনই কোন কিছু দেখবার সুযোগ তার হবে না।

বাচ্চু মনে মনে কামনা করতে লাগল এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে দাছু যেন হেরে যায়। মা যেন ওই বুড়োর হাত থেকে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

একটু বাদে গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা গেল। ঝকঝকে তকতকে একখানা ট্যাক্সি বাচ্চুদের বাড়ির একেবারে সদর দরজার কাছে এসে থামল। প্রভাত ড্রাইভারের সীট থেকে নিচে নেমে দাঁড়াল। বাচ্চু ছুটে গেল দোরের কাছে। তার মনে হল ভগবান তার ডাক শুনে প্রভাতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবার আর কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবে না। তার বুড়ো দাদুর সাধ্য কি এই লম্বা-চওড়া জোয়ান পুরুষের হাত থেকে তাকে কেড়ে রাখে। সত্যি, দাড়ি রাখলে আর মাথায় পাগড়ী বাঁধলে প্রভাতকে পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভার বলে ভুল করা যেত। ট্রাউজার আর হাফসার্ট পরা বেশ শক্ত গোছের চেহারা। দেখেই মনে হয় তার শরীরে খুব জোর আছে।

বাচ্চু আশা করতে লাগল তার বুড়ো দাদুর উপর দিয়ে শক্তির মহিমাটা দেখাবে প্রভাত।

আড়ালে গিয়ে তাদের মধ্যে কী যেন কথাবার্তা হল। একটু বাদে প্রভাত ফিরে এসে বাচ্চুর মাকে বলল, 'উনি ওকে এখন মোটেই ছাড়তে চাইছেন না। জোর করে তো কোন লাভ নেই। পরে ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে। চল এবার যাওয়া যাক। আচ্ছা বাচ্চু—গুড বাই।'

যাওয়ার সময় ইভা গোপনে পাঁচ টাকার একখানা নোট বাচ্চুর হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। বাচ্চুর ইচ্ছা হল নোটখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সে কি মার কাছে টাকা চেয়েছে?

কিন্তু বাচ্চুর মা শুধু টাকা নয়, তাকে আরো সান্ত্বনা দিয়ে গেল, 'তুই ভাবিসনে। যেমন করে পারি আমি তোকে নিজের কাছে নিয়ে যাব। তোকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকব না।'

চার

সারা পথটা ইভা স্বামীকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। বারবার তাকে উত্যক্ত ও উত্তেজিত করতে লাগল। আসলে তুমি একটা পুরুষই নও। সাহস বলে কোন পদার্থ তোমার মধ্যে নেই। নইলে ওই একটা বুড়োর হাত থেকে তুমি বাচ্চুকে কেড়ে আনতে পারলেনা ?'

প্রভাত ড্রাইভ করতে করতে বলল, 'আমার সাহস আছে কি না আছে তার প্রমাণ আমি অনেকবার দিয়েছি। সব সময় সব কাজ গায়ের জোরে হয় না ইভা। কৌশল বলেও একটা জিনিস আছে। কোন কোন সময় তার জোরেই কাজ উদ্ধার হয়। তাছাড়া বাচ্চুর জন্যে তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? ও বড় হয়ে গেছে। ওর জন্যে অত ভাবনা কিসের তোমার ?'

ইভা বলল, 'ভাবনা যে কিসের তুমি তা বুঝবেনা। তুমি তো আর মা হলেনা।'

প্রভাত হেসে বলল, 'না, এজন্মে সে অভিজ্ঞতা আর হবেনা। বাপও হয়েছি কিনা ঠিক কি। নিতান্তই তুমি বলে দিয়েছ বলে বুলা আর রন্টু বাবা বাবা বলে ডাকে। না বললে কিছুই করবার জো ছিলনা।'

ইভা বলল, 'যাও, তোমার ও ধরনের ঠাট্টা তামাসা আমার সব সময় ভালো লাগেনা।'

মানিকতলার পাটকেলে রংএর তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়িটার

পিছনের দিকে একতলার দুখানা ঘর নিয়ে প্রভাত থাকে। স্ত্রীকে বাড়ির সদর দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে প্রভাত ট্যাক্সি নিয়ে ফের বেরিয়ে প ড়ল

ইভা বাধা দিয়ে বলল, 'ভিতরে আসবেনা একবার? চা-টা খেয়ে যাবেনা?'

প্রভাত বলল, 'না। বারাসতে গিয়ে আজ সারাদিনটাই লোকসান হল। ড্রাইভারের মাইনেটা পর্যন্ত আজ ওঠেনি তা জানো? দেখি বেরিয়ে। খানিকটা উশুল করা যায় কিনা।'

প্রভাত গাড়ি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

কড়া নাড়তে প্রভাতের পিসিমা জ্ঞানদা এসে দোর খুলে দিলেন। বললেন, 'এসো বাছা। তোমার ছেলে-মেয়ে দুটিকে আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে যেই বেরিয়েছ, কেঁদে কেটে চেঁচিয়ে ওরা তো অস্থির। দুপুরে আমাকে একটু ঘুমুতে পর্যন্ত দেয়নি। এর পর থেকে যেখানে যাবে ওদের সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।'

ইভা বলল, 'আমি তো নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম পিসীমা। আপনার ভাইপোই নিতে দিলেন না।'

সাড়া পেয়ে বুলা আর রণ্টু এসে ইভাকে জড়িয়ে ধরল।

রণ্টু বলল, 'মা, আমাদের ভুলিয়ে ফেলে চলে গিয়েছিলে তুমি?'

ইভা বলল, 'দূর বোকা। ভুলিয়ে ফেলে যাব কেন। আর একদিন তোদের নিয়ে যাব।'

বুলা বলল, 'মা, দাদাকে আনলেনা?'

ইভা গম্ভীরভাবে বলল, 'না, সে আসতে পারল না। তার ঠাকুরদা তাকে আসতে দিলেন না। কিন্তু আমি যেমন করেই পারি তাকে আনবই।'

জানদা চশমা চোখে দিয়ে স্ুঁচে স্ুতো পরাচ্ছিলেন। কাজটা শেষ করে বললেন, 'কি দরকার বাপু অত জোর জবরদস্তি করে। যাদের ছেলে তাদের কাছে থেকে মানুষ হওয়া ভালো। তুমি যে তাকে নিয়ে ফের কেন বাড়াবাড়ি করতে যাচ্ছ আমি ভেবে পাইনে। ভগবান আবার তোমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। ষষ্ঠীর আশীর্বাদে প্রভাতের ঘরে ছেলে হয়েছে মেয়ে হয়েছে। আর তোমার কিসের অভাব বাছা ?'

পিসী-ভাইপোর যুক্তিটা যে একই ধরণের ইভা তা আগেও লক্ষ্য করেছে আজও লক্ষ্য করল। আসলে বাচ্চু এখানে আসুক সেটা না পছন্দ করেন পিসী, না ভাইপো। একটি ভিন্ন পরিবারের ছেলে বলে নয়, বাচ্চু এখানে এলে সেই সূত্রে অনেক কথা প্রভাতের আর তার পিসিমার মনে পড়ে যায়। ইভা আর এক-জনের স্ত্রী ছিল, মা ছিল, এ-সব কথা তার স্বামী কি পিসি-শাশুড়ী কেউ মনে করতে চান না। আর একবার যখন বাচ্চু এখানে এসেছিল এই সব সমস্যাই উঠেছিল তখন। প্রতিবেশী কি অন্য আত্মীয়-কুটুম্বের কাছে প্রভাতের পিসিমা বাচ্চুর যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্য নয়। তিনি কখনো বলেছিলেন, বাচ্চু তাঁদের দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের ছেলে, কখনো বলেন সে ইভার মা-মরা বোনপো। খুব ছেলেবেলায় মা মারা গেছে, তাই ইভাকেই মা বলে জানে, মা বলে ডাকে।

নিজের ছেলের মাসী হতে ইভার মন সায় দেয়নি। সে স্বামীর কাছে প্রতিবাদ করে বলেছে, 'পিসিমার এ-সব কি কাণ্ড বল দেখি।'

প্রভাত হেসে বলেছে, 'যেতে দাও। পিসিমা যদি তোমাকে তোমার ছেলের মাসীমা বানিয়ে থাকেন তাহলে [illegible] তো

তুমি আর মাসিমা হয়ে গেলেনা। নিজের পেটে ধরবার প্রমাণ তো তোমার নিজের হাতেই আছে। কিন্তু পুরুষের বেলায় সে সুবিধে নেই। তাকে আন্দাজে আন্দাজে দিন কাটাতে হয়। কেউ যদি বলে তুমি তোমার ছেলের বাপ নও, মেসো, জোর করে তার না বলবার জো নেই।'

ইভা ধমক দিয়ে উঠেছে, 'কোত্থেকে এক বস্তাপচা রসিকতা তুমি জুটিয়েছ। তোমার মুখে ও-সব ছাড়া কি আর কোন কথা নেই?'

শুধু এই ধরনের রসিকতাই নয়, প্রভাতের অনেক চালচলন ধরনধারনই ইভার আজকাল আর ভালো লাগে না। অবশ্য ট্যাক্সি চালালেও প্রভাতকে ঠিক সাধারণ ট্যাক্সিওয়ালার মত মনে হয় না। ভদ্রঘরের ছেলে। আই. এ. পাশ করেছে। বি. এ. পড়তে পড়তে তার মাথা বিগড়ে যায়। প্রভাত বলে মাথা বিগড়াবার কারণ নাকি ইভা নিজে। বইয়ের পাতা খুললে কালো কালো অক্ষরগুলি ছাপিয়ে বন্ধুপত্নীর মুখই পাতায় পাতায় ভেসে উঠত। যত সব বাজে কথা। এ-সব কথা শুনলে ইভার এখনো লজ্জা হয়, নিজেকে অপরাধিনী বলে মনে হয় তার। প্রভাত এখন যাই বলুক, যতই ঠাট্টা-তামাসা করুক, প্রথম প্রথম তাদের মধ্যে ও-ধরণের কোন সম্পর্কই ছিল না। বেশ মনে আছে, কলেজে যখন পড়ত, কী মুখচোরা স্বভাবই না ছিল প্রভাতের। ইভার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবার সাহস পর্যন্ত ছিলনা তার। সেই প্রভাত আজ ইভার স্বামী। তার হর্তা-কর্তা বিধাতা।

ইভার প্রথম স্বামী অতুলের বিদ্যার দৌড়ও বেশি ছিলনা। বার দুই ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করে সে শ্যামবাজারের এক ওষুধের

দোকানে চাকরি নিয়েছিল। সেলস্‌ম্যানের কাজ করত, বিল লিখত। সকাল আটটায় বেরোত আর ফিরতো রাত দশটা-এগারটায়। যে রাত্রে ফিরতে পারতনা, বাস বন্ধ হয়ে যেত, রাত কাটিয়ে আসত প্রভাতদের ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে। প্রভাতের দাদা প্রফুল্লই আসলে সমবয়সী বন্ধু ছিল অতুলের। সে মারা যাওয়ার পর বয়সে চার-পাঁচ বছরের ছোট হয়েও প্রভাত অতুলের বন্ধুর স্থান নেয়। কিন্তু তা বলে প্রফুল্লর মত ঠাট্টা-ইয়ার্কি অতুলের সঙ্গে সে করতনা, ইভার সঙ্গেও না। বরং দুজনকে একটু সমীহ করেই চলত প্রভাত।

অতুলের বাবার ইচ্ছা ছিল না সামান্য মাইনেয় অতুল দিনরাত পরের দোকানে খাটে। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'কেন তুই গাধার মত পরের ব্যবসায় মোট বয়ে বেড়াচ্ছিস। তার চেয়ে আমার জমি-বাগানে কাজ কর। আমি একা একা খাটি, আমাকে সাহায্য কর। তাতে ফসল বাড়বে, সম্পত্তির আয় বাড়বে। যদি বাড়াতে নাও পারিস, আমার যা আছে শুধু সেইটুকুও তুই যদি দেখে-শুনে খেতে পারিস তোর সংসার সুখে-স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।'

অতুলের মা আর ইভারও সেই মত ছিল। তাদেরও ইচ্ছা ছিল অতুল সারাদিন বাড়িতে থাকে, নিজের ঘর-বাড়ি-জায়গা-জমির যত্ন নেয়। কিন্তু অতুলের সেদিকে মোটেই মন গেলনা। দেখতে শান্তশিষ্ট মানুষ হলে কি হবে ভিতরে ভিতরে জেদ তারও কম ছিলনা। নিজে যেটা করবে বলে ভাবত, নিজে যেটাকে ভালো বলে মনে করত তা থেকে কেউ তাকে নড়াতে পারতনা।

অতুল বলত, 'জানো ইভা, সারাদিন বাইরে থাকবার পর অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরি তোমাকে কি রকম যেন নতুন নতুন

লাগে। শুধু তোমায় নয়, বাড়িঘর গাছপালা সব জিনিসেরই যেন স্বাদ আর চেহারা পালটে যায়। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে, পাঁচটার পর থেকে আমার মন কেবলই ছটফট করতে থাকে কখন বাড়ি ফিরব, কখন বাড়ি ফিরব। কখন তোমাকে দেখতে পাব। কিন্তু সারাদিন যদি বাড়িতেই থাকি তাহলে কি আর মনের ওই রকম অবস্থা থাকবে ?'

ইভা হেসে বলত, 'তাহলে এক কাজ কর। আমাকে সারাদিন ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রাখ। আমি সেখান থেকে আর বেরোবনা। আমি আছি কি নেই তুমি দিনের মধ্যে সে-কথা জানতে পারবেনা। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে এখনকার মতই অনেক রাত্রে ঘরে এসে আমাকে দেখলে তেমন আর পুরোন মনে হবেনা, কি বল ?'

অতুল কিন্তু এই ঠাট্টা-তামাসা গ্রাহ্য করত না। বলত, 'তুমি দেখে নিও, ভবিষ্যতে আমি উন্নতি করব। কাজকর্ম শিখে নিয়ে আমি নিজেই একটা ওষুধের দোকান দেব। নাম কি দেব জান ? ইভা ফার্মেসি।'

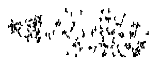
অতুল আরো অনেক কথা বলত। শুধু দোকান নয়, ওষুধ তৈরীর ছোট-খাট একটা কারখানা করবে। কলকাতায় তো অত বড় জায়গা পাওয়া যাবে না। এই বারাসতের জমিতেই সেই কারখানার ভিত পুঁতবে, বাড়ি তুলবে অতুল। আর যত ওষুধ কি ফুড বেরোবে সবগুলির গায়ে লেখা থাকবে ইভা। অতুলের প্রিয় নাম সকলের মুখে মুখে ফিরবে। দুনিয়াশুদ্ধু ছড়িয়ে পড়বে ওই দুটি প্রিয় অক্ষর। এত বড় ঐশ্বর্য হঠাৎ একদিনে আকাশ থেকে নামবে না কি মাটি ফুঁড়ে উঠবে না। আলাদীনের আশ্চর্য

প্রদীপ তো অতুলের হাতে নাই, তবে ঘরের মধ্যে আছে। সেই আলোর কাছে উৎসাহ পাবে, আনন্দ পাবে অতুল, সারাজীবন কাজ করার শক্তি পাবে। রাত জেগে কত কথাই না বলত অতুল। সে সব কথার সবই যে ইভার বিশ্বাস হত তা নয়, কিন্তু রূপকথার মত সুখ-স্বপ্নের মত তা আনন্দ দিত।

প্রভাত সে ধরনের মানুষ নয়। অত নরম নরম কথা বলতে সে ভালোবাসে না। কথার চেয়ে তার কব্জির জোর বেশি। এই জোরের পরিচয় প্রথম প্রথম অবশ্য তেমন পায়নি ইভা। গোড়ার দিকে মুখচোরা প্রভাত চোখ তুলে তার দিকে তাকাতই না। তবে সুযোগ পেলেই সে অতুলের সঙ্গে আসত। বাড়ির মধ্যে তত যেত না। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। অখিলবন্ধুর চাষ-বাস খেত-খামার আর আম-কাঁঠালের বাগানের প্রশংসা করত। বলত, 'মেসোমশাই, আপনার এই বাড়িকে মনে হয় আশ্রম। এমন সুন্দর জায়গা আর আমি দেখিনি। সহর থেকে এখানে এলে কানও জুড়ায়, চোখও জুড়ায়। মনে হয় মাঝে মাঝে এসে এখানে থাকি।'

অখিলবন্ধু হেসে বলতেন, 'বেশ তো প্রভাত, কয়েকদিন থাকনা এসে এখানে। অতুল সেই ভোরে বেরিয়ে যায় আর রাত দুপুরে ফেরে। আমি সারাদিনের মধ্যে একজন কথা বলবার লোক পাইনে। ইভা অবশ্য আছে, তোমার মাসীমাও আছেন। কিন্তু ঘর-সংসার, রান্না-বান্নার কথা ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে সারাদিন আর কোন কথা বলা যায় না। ওরা কি দুনিয়াদারির কোন খবর রাখে, না ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভাবে?'

প্রভাত হেসে সায় দিয়ে বলত, 'ঠিক বলেছেন মেসোমশাই। মেয়েদের ওসব বালাই নেই।'



খেতে বসে প্রভাত কিন্তু অন্যরকম কথা বলতে শুরু করত। বলত, 'মাসীমা, তরকারিটা চমৎকার রেঁধেছেন।'

নলিনী গলা ছেড়ে বলতেন, 'ইভা প্রভাতকে আর একটু তরকারি দিয়ে যাও তো। ওটা ইভারই রান্না, আমার নয়।'

ইভা ফের তরকারির থালাটা নিয়ে আসত। কিন্তু প্রভাত তরকারি আর নিত না। সরাসরি ইভার সঙ্গেও কথা বলত না। নলিনীর দিকে চেয়েই হেসে বলত, 'আপনাদের রান্নার সুখ্যাতি করবার এই এক বিপদ। হেঁসেলে যত তরকারি আছে সব একজনের পাতে ঢেলে দেবেন। নিজেদের জন্যে কিছু না রাখতে চান না রাখুন, কিন্তু অতুলদার জন্যে কিছু রাখতে হয়।'

নলিনী হেসে বলতেন, 'সেজন্যে ভাবনা নেই তোমার। তার জন্যে যে রাখবার সে ঠিকই রেখে দেবে। রান্নাটা আমার নয়, ইভার।'

শাশুড়ীর এই পরিহাসে ইভা খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ত।

প্রভাত তখনও ইভার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ব্যগ্রতা দেখাত না। নলিনীর সঙ্গেই আলাপ করে চলত।

'সে তো একই কথা মাসীমা, বউদির রান্নাও যা, আপনার রান্নাও তাই। আপনি না শিখিয়ে দিলে বউদি এসব পাবেন কোথায়? আপনি দেখিয়ে দেন বলেই তো সব এত ভালো হয়। উনি হাতা নাড়েন, আপনি ওঁর হাত নেড়ে দেন, আমরা সবই জানি।'

প্রভাতের স্তুতিতে নলিনী খুব খুশি হয়ে উঠতেন। হেসে বলতেন, 'না বাবা, আমার বউমা আজকালকার মেয়েদের মত নয়, শুধু পটের বিবি সেজে থাকতে চায় না। নিজের হাতে সব করে, কাজকর্ম করতেও জানে বেশ।'

তখন প্রভাত আর ইভা দুজনের ওপরই নলিনী খুব খুশি ছিলেন।

প্রভাত তখন ইভার সঙ্গে বেশি কথা বলত না। তবে অতুলের সঙ্গে কি তার মা'র সঙ্গে যেসব কথা বলত সেগুলি ইভাও শুনুক, সেসব কথার ব্যঞ্জনা ইভাও বুঝতে পারুক প্রভাত তা প্রত্যাশা করত। ইভার ওপর প্রভাতের যে এক ধরনের আকর্ষণ আছে তা ইভার জানা ছিল না। আসবার সময় প্রভাত শুধু হাতে বিশেষ আসত না। কখনো ফুল, কখনো ফল, কখনো মিষ্টি, কখনো বা মাংস, কিছু না কিছু নিয়ে আসত।

অতুল মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত, 'প্রভাত তোমাকে খুব পছন্দ করে।'

ইভা প্রতিবাদ করে বলত, 'পছন্দ না আরো কিছু। এখানে এসে আমার সঙ্গে ক'টা কথা হয় শুনি? গল্পটল্প যা করবার তোমাদের সঙ্গেই তো করে।'

অতুল জবাব দিত, 'তা করলে কি হয়। লক্ষ্যটা তোমার দিকেই।'

কিন্তু হাসি কৌতুকের মধ্যেই ব্যাপারটা তখনকার মত শেষ হয়ে যেত। কি অতুল, কি তার বাপ-মা কেউ কোনরকম সন্দেহ কি আপত্তি করেনি।

তারপর বেশি রাত্রে কলকাতা থেকে ফেরবার সময় বাস অ্যাকসিডেণ্টে যখন মৃত্যু হল অতুলের, সেই দুঃসময়ে বন্ধুর মতই প্রভাত ইভার সামনে এসে দাঁড়াল। অর্থের অভাব ছিল না। শ্বশুর-শাশুড়ী মাথার ওপর আছেন। সংসারের কোন ভাবনাই ইভাকে ভাবতে হয় না। বাচ্চুকেও বেশির ভাগ সময় তাঁরাই

আগলে নিয়ে বেড়ান। আর কোন অভাব অনটনই নেই ইভার। কিন্তু একজনের অভাবে সবই শূন্য হয়ে গেছে। প্রভাত এসে তখন অনেকখানি জায়গা জুড়ল। কিন্তু তখন স্বামীর বন্ধু ছাড়া প্রভাত ইভার কাছে বেশি কিছু নয়। অতুলের অপমৃত্যুর জন্যে বাস কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের জন্যে উঠে-পড়ে লাগে প্রভাত। লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিতে আড়াই হাজার টাকার পলিসি ছিল, সে টাকা আদায় করে। যেখানে চাকরি করত অতুল, সেই ন্যাশনাল ড্রাগস্‌ থেকে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাটা আনে।

অখিলবন্ধু প্রভাতের ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠেন, 'এত ঘোরাঘুরি বাপু আমি করতে পারতাম না। তুমি ছিলে তাই টাকাগুলি হাতে এল, নইলে আমার সাধ্যও ছিলনা এই হাজার সাতেক টাকা এক জায়গায় করি। এত ঘোরাঘুরি আমি করতেই পারতাম না।'

প্রভাত জবাব দেয়, 'কী যে বলেন মেসোমশাই। আপনার হকের টাকা সবাই বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে যেত। আপনার মত ধর্মপ্রাণ মানুষের টাকা কেউ কেড়ে নিতে পারে? চেক্‌গুলি এবার আপনার ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিন মেসোমশাই।'

অখিলবন্ধু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'না বাবা, ও টাকা আমি ছুঁতে পারব না। আমার ছেলের জীবনের বিনিময়ে ওই রক্তমাখা টাকা কিছুতেই আমার হাতে উঠবে না। তার চেয়ে তুমি বরং এক কাজ কর। ভালো একটা ব্যাঙ্কে ইভার নামেই টাকাগুলি রেখে দাও।'

প্রস্তাবটা ইভার শাশুড়ী নলিনীর মোটেই মনঃপূত হয়নি। তিনি বলেছিলেন, 'ও আবার কি কথা। অত টাকা অমন অল্পবয়সী

বউয়ের নামে কেন রাখবে শুনি ? আমি তো জানি, টাকা-কড়ির হিসাব বাড়ির যিনি কর্তা তাঁর কাছেই থাকে।'

অখিলবন্ধু বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'না না না, ও টাকা ইভার নামেই থাক। আমার তো মতিগতির ঠিক নেই। জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কাজেই লাভ লোকসান আছে। কখন কোন্ ঝোঁকের মাথায় খরচ করে বসব টেরও পাবনা। তার চেয়ে ইভার অ্যাকাউণ্টে থাকলে টাকাটা নিরাপদে থাকবে।'

নলিনী বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'কাকে তুমি কি বোঝাচ্ছ বল তো ? আমি কি এতই বোকা ? এতদিন তোমার সঙ্গে ঘর-সংসার করলাম আর তোমার মনের কথাটা আমি বুঝতে পারব না ? ইভাকে তুমি টাকাটা দান করতে চাও। এইতো কথা ?'

অখিলবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন, 'কে কাকে কার টাকা দান করে ? সে কথা যদি বল, ও টাকা তো ইভারই।'

ইভা বলেছিল, 'না বাবা, ওসব কি বলছেন আপনি ? ও টাকা আমার কেন হবে ? আপনার নামে যদি না রাখতে চান মার নামে রাখুন।'

নলিনী রাগ করে উঠে বলেছিলেন, 'খবরদার, আমার নাম এর মধ্যে টেনে এনোনা বলছি। আমি কি এতই টাকার কাঙাল, ওই টাকা আমি ছোঁব ? লাখ লাখ টাকা দিলেও যাকে কেনা যায় না, আমার সেই সোনার মাণিকই আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তাকেই আমি আর ফিরে পেলাম না, আর ওই টাকা কটি নিয়ে আমি জাত নষ্ট করব ? টাকায় তোমাদের ক্ষতিপূরণ হতে পারে, আমার হয় না।'

অনেক সাধ্য সাধনা করা হয়েছিল নলিনীকে। কিন্তু তিনি

কিছুতেই তাঁর নিজের অ্যাকাউণ্টে টাকাটা রাখতে রাজী হননি। বলেছেন, 'অতুল যখন সব জায়গায় তার স্ত্রীকেই নমিনি করে গেছে, চেকপত্রগুলিও ইভার নামে এসেছে, তখন তার নামে টাকা রাখলেই অতুলের ইচ্ছামত কাজ করা হবে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজই করবনা।'

তাই লএডস্ ব্যাঙ্কে ইভার নামেই অ্যাকাউণ্ট খোলা হল। প্রভাতই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিল। পাস-বই আর চেক-বই যখন ইভার নিজের হাতে এল, সেগুলির ওপরে তার নিজের নাম লেখা দেখে ভিতরে ভিতরে সে বেশ একটু প্রসন্নই হল। যদিও তা কাউকে বুঝতে দিল না।

তারপরের ঘটনাগুলি খুবই দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়েছিল। অখিলবন্ধু স্ত্রীকে নিয়ে যখন চার্চে কি অন্য কোন আত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতেন ইভাকেও তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইতেন, কিন্তু ইভা কোন না কোন অজুহাতে তাঁদের সঙ্গ এড়িয়ে চলত। আর ফাঁক বুঝে প্রভাত এসে হাজির হত। শুধু বন্ধু বা হিতৈষীর বেশে নয়, ওসব ছদ্মবেশ সে তখন খোলসের মত ছেড়ে ফেলেছে। বলবার কথা অতি স্পষ্ট ভাষায় বলতে শুরু করেছে প্রভাত। ইভাকে তার না হলেই চলবে না।

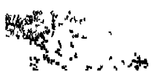
আর—না, না, তা হয় না, হয় না—করতে করতে ইভা ক্রমেই এগোচ্ছে। প্রভাত শুধু তাকে আচমকা বুকেই চেপে ধরেনি, হাতের মুঠোয়ও এনে ফেলেছে। অথচ স্বামীকে যে ইভা মোটেই কম ভালবাসত না সে-কথা কেউ এখন বিশ্বাস করবে না। প্রভাতের সঙ্গে ইভা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবার পর ইভার শাশুড়ী এ-কথা

পর্যন্ত রটিয়েছিলেন যে, স্বামী থাকতেই প্রভাতের সঙ্গে ইভার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তখন থেকেই সকলের চোখে ধুলো দিতে শুরু করেছিল ইভা।

টাকা আর গয়নাগাঁটি ইভা ফেলে আসেনি। কেনই বা আসবে। এসব তো তারই। তবু এ নিয়েও কম অপবাদ রটেনি ইভার নামে। সে নাকি শাশুড়ীর গয়না আর শ্বশুরের টাকাও চুরি করেছে। যেখানে যা পেয়েছে দুহাতে লুটে-পুটে নিয়েছে। ফেলে এসেছে শুধু বাচ্চা ছেলেকে। সেই ডামাডোলের মধ্যে সত্যিই বাচ্চুকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া প্রভাতও বাধা দিয়েছিল, 'ওসব করতে যেয়ো না, তাতে পরিণামে তোমার ছেলেরই ক্ষতি হবে? তোমার সঙ্গে এলে সে কানা কড়িও পাবে না। ওখানে থাকলে বুড়োর সমস্ত সম্পত্তিই তার ভোগে আসবে।'

ইভা আর কোন কথা বলেনি। তখন প্রভাতের মতের বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতাও ছিল না। তখন তার গর্ভে প্রভাতের সন্তান। তাকে কি করে বৈধ করা যায় সেই চিন্তায় সে ব্যস্ত। বাচ্চুর কথা ভাববার তার আর সময় ছিল না। তবু তার ওপর নির্ভরশীল ঘুমন্ত ছেলেকে ফেলে পালিয়ে আসতে ইভা কিছুক্ষণের জন্যে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছিল বইকি। নাড়ি ছেঁড়ার যন্ত্রণা তীব্রভাবেই অনুভব করেছিল। তবু তার চলে না এসে উপায় ছিল না।

বাচ্চুর সঙ্গে ফের তার যোগাযোগ হল বছর পাঁচেক পর। ততদিনে রণ্টু আর বুলা এসে গেছে। ট্যাক্সির ব্যবসা জমিয়ে তুলেছে প্রভাত। সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ স্থায়ীভাবে সংসার পেতেছে ইভা। যে পিসীমা রাগ করে চলে গিয়েছিলেন, প্রভাতের বিয়েকে



সমর্থন করতে পারেননি, তিনি ফিরে এসে ইভার ছুটি ছেলেমেয়েকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

এই সময় চিঠি এল সুনন্দার কাছ থেকে। পাশের বাড়ির এই স্বামীকে ছেড়ে আসা মেয়েটির সঙ্গে ইভার বহুদিনের বন্ধুত্ব। এত কাণ্ডকারখানা ওলট-পালটের মধ্যেও সেই সৌখ্য নষ্ট হয়নি। তার সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ ইচ্ছা করেই রেখেছিল ইভা। বাচ্চুর খবর তার চিঠিপত্রেই পেত। তার নিউমোনিয়ার কথাও সুনন্দা জানিয়েছিল। সে লিখেছিল, 'ছেলের শক্ত অসুখ। এখন আর তোমার মান অভিমানের সময় নয়। দেখতে যদি চাও, চলে এসো।'

সব শুনে প্রভাত আপত্তি করেনি। বরং গাড়ীতে করে স্ত্রীকে পৌঁছেই দিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'টাকা-পয়সার দরকার থাকলে বল।'

ইভা জবাব দিয়েছিল, 'টাকা-পয়সার অভাব তাদের নেই। অভাব বুদ্ধি-বিবেচনার।'

তবু সারাটা পথ সাহস নিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকবার সময় ইভার পা কেঁপে উঠল, বুকের মধ্যেও ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ছেলের অসুখের কথা ভেবে নয়, শ্বশুর-শাশুড়ীর হাতে তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সেই আশঙ্কায়।

অখিলবন্ধুই তাকে প্রথমে দেখতে পেয়েছিলেন। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলেছিলেন, 'এসো, ভিতরে এসো?'

সে আহ্বানের মধ্যে কোন প্রসন্ন আন্তরিকতা ছিল না। কিন্তু তিনি যে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসেননি, কড়া কড়া কথা বলে ইভাকে বাড়ি থেকে বের করে দেননি, সেইজন্যে কৃতজ্ঞ রইল ইভা।

নলিনী অত সহজে ছেড়ে দিলেন না। ইভার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি কেন এসেছ?'

ইভা তার চেয়েও সংক্ষেপে জবাব দিল, 'বাচ্চুকে দেখতে।'

তারপর আর কারো কোন আদেশ-নির্দেশের অপেক্ষা না করে সোজা বাচ্চুর বিছানার কাছে গিয়ে বসল। তার কপালে হাত রেখে বলল, 'বাচ্চু, কোন ভয় নেই বাবা। আমি এসেছি।'

বাচ্চু ক্ষীণস্বরে বলল, 'জানতাম তুমি আসবে। আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম মা।'

এ-কথা শুনে ইভার চোখ ছল ছল করে উঠেছিল। কিন্তু চোখের জল ছেলের রোগ-শয্যায় পড়তে দেয়নি। তাতে অকল্যাণ।

নলিনী ব্যাপারটা পছন্দ করেননি। কিন্তু সেখান থেকে ইভাকে তুলে আনার শক্তিও তাঁর ছিল না। বাচ্চু তার হারানো মাকে ছাড়লে তো।

কদিন ধরে ইভার নাওয়া-খাওয়া ঘুমোনোর কিছু ঠিক ছিল না। পাড়ার বিমল ডাক্তার পর্যন্ত তার প্রশংসা করেছিল। শুশ্রূষায় এমন নিষ্ঠা, এমন দক্ষতা তিনি আর দেখেননি।

বাচ্চু সুস্থ হয়ে উঠবার পর ইভা তার আগের শ্বশুরবাড়িতে আরো কয়েকবার গেছে। বাচ্চু ছাড়া কেউ তাকে আদর করে ডেকেও নেয়নি, আবার দূর দূর করে তাড়িয়েও দেননি। ইভা নিজের জোরেই সেখানে খানিকক্ষণের জন্যে তার স্থান করে নিয়েছে। বার দুই বাচ্চুকেও নিয়ে এসেছিল। সেও প্রায় জোর করে। ইভা ভেবেছিল, সে এবারও সেই জোর খাটতে পারবে। অন্তত দু'চারদিনের জন্যে নাতিকে ছেড়ে দিতে অখিলবন্ধু আর

আপত্তি করবেন না। কিন্তু এবার তাঁর ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে গেছে ইভা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভদ্রলোক যেন একেবারেই বদলে গেছেন। নলিনীর সঙ্কীর্ণ মন যেন অখিলবন্ধুর মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। নাহলে এমন অহেতুকভাবে নিষ্ঠুর তিনি হতে পারতেন না। ইভার অনুরোধে বাচ্চুর আবদার অন্তত একটিবারের জন্যেও রাখতেন।

কাজকর্ম সেরে ট্যাক্সি গ্যারেজে পাঠিয়ে, ড্রাইভার দুলালের কাছ থেকে হিসাব-পত্র বুঝে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারটা হয়ে গেল প্রভাতের। তার রকম-সকম দেখেই ইভা বুঝতে পারল মদে একেবারে চুর হয়ে এসেছে। ভাত কিছুতেই খাবে না। বলে, 'ক্ষিদে নেই।'

পিসিমা ধমকে উঠলেন, 'ক্ষিদে থাকবে কোন্ পেটে? আজ আবার সেই ছাইভস্ম কতকগুলো গিলে এসেছিস্। ছি ছি ছি, লজ্জাও করে না? বিয়ে-থা করেছিস, ছেলেমেয়ে হয়েছে, এখনো এসব বদখেয়াল গেল না তোর?'

ইভাও রাগ করতে লাগল। পিসি-শাশুড়ির সঙ্গে তার আর কোন ব্যাপারেই মতের মিল নেই। কিন্তু এই একটি বিষয়ে ইভা খুব কৃতজ্ঞ। তিনিও প্রভাতের এই নেশা করার অভ্যাসকে সহ্য করেন না। ভাইপোকে বকে ধমকে অস্থির করে তোলেন। কিন্তু শাসন করলে কী হবে? শাসন করবার বয়স কি আর প্রভাতের আছে? পিসিমার শাসনও মানে না, ইভার অনুরোধ উপরোধও রাখে না। রাগ অভিমান করলে হাসে, 'তোমাদের মেয়েদের ওই এক অবুঝ সংস্কার আছে। মদ খেলেই জাত যায়।'

ইভা বলে, 'জাত না যাক, টাকা যায়, শরীর নষ্ট হয়, একথা তো মানো ?'

প্রভাত বলে, 'তুমি ওসব বুঝবে না ইভা। আমাদের মত সারাদিন যারা খাটে, তাদের ওসব না হলে—একটু আধটু না হলে চলে না। ওতে কাজকর্মের শক্তি বাড়ে তা জানো ?'

ইভা বলে, 'ছাই বাড়ে। ওই অজুহাত পেয়েছ তোমরা। বদখেয়াল মেটাবার অসার বাজে যুক্তি।'

কিন্তু প্রভাত আজ আর ওসব বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে গেল না। কোনরকমে নাকে-মুখে ত্নটি গুঁজে দিয়ে বিছানায় পড়েই টান টান হয়ে ঘুমুতে লাগল।

স্বামীর পাশে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ইভার ঘুম এল না। আজ কেন যেন বারবার বাচ্চু আর তার বাবার কথা মনে পড়ছে। বাচ্চুকে যদি নিজের হাতে গড়ে তুলবার সুযোগ পায় ইভা, তাকে তার বাবার মত করেই গড়ে তুলবে। কিছুতেই প্রভাতের মত হতে দেবে না। শুধু বাচ্চুকে নয়, রন্টুকে ও বুলাকেও। তাদেরও সে অতুলের আদর্শেই গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

পাঁচ

বেলা সাড়ে এগারটা-বারোটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেল ইভার। প্রভাত সবদিন দুপুরে বাড়িতে খায় না। ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যে পাড়ায় দুপুর হয়, তার কাছাকাছি কোন একটা হোটেলে খেয়ে নেয়। ভাতের চেয়ে রুটি-মাংসই তার পছন্দ। কোনদিন বা পাঁউরুটি আর মিষ্টিতেই কাজ সারে। এত যত্নে রান্না-বান্না করে তা যদি বাড়ির পুরুষ মানুষটির সামনে ধরে দেওয়া না যায়, যদি তার চোখে-মুখে তৃপ্তির চিহ্ন না ফুটে উঠতে দেখা যায়, তাহলে কি ভালো লাগে? ইভারও প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত। আজকাল সয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে স্বামীকে অনুযোগ দেয় ইভা, 'তুমি যদি না খাবে এত সব রাঁধি কার জন্যে?'

প্রভাত বলে, 'খাইয়ে কি বাড়িতে আমি একা নাকি? তুমি খাও, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াও, আমার পিসীমা আছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই বয়সেও তাঁর মুখের রুচি আর জিভের স্বাদ বেশ আছে।'

ইভা হেসে বলে, 'থাকবে বইকি। সংসারে খাটবেন-খুটবেন, দেখাশোনা করবেন, আর খাবেন না? কিন্তু একজন কেন, হাজারজন থাকুন না, তবু তুমি যদি কাছে বসে না খাও আমার মোটেই ভালো লাগে না।'

প্রভাত বলে, 'কি করব বল। আমার পেশা আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। দুপুরে ঘরে বসে বউয়ের হাতের ভাত-তরকারি

আর পাখার হাওয়া খাব তেমন ভাগ্য আমার নয়। সে সুখ অতুলদা পেয়েছে। আবার আমি মারা যাওয়ার পর ফের যদি দশটা-পাঁচটার কোন কেরানীর হাতে পড় —'

ইভা বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়, 'ফের ওসব কথা ? আমি তোমাকে বলিনি, ওসব ঠাট্টা-তামাসা আমি মোটেই পছন্দ করিনে ?'

প্রভাত হাসতে থাকে, 'সত্যি, যে ভদ্রলোক তোমাদের জলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তাঁর মাথা আছে বলতে হবে। জলেরও যেমন আকার নেই, তোমাদেরও তেমনি। ঘটিতে রাখ ঘটি, কলসিতে রাখ কলসি, আবার গ্লাসে রাখ গ্লাস। স্বামীর ধর্মই তোমাদের ধর্ম, তার পেশাই তোমাদের পেশা, তার অভ্যাসেই তোমাদের অভ্যাস।'

পৃথিবীকে যেন এক নূতন তত্ত্বকথা শুনিয়েছে তেমনি আত্ম-প্রত্যয়ে আর আত্ম-প্রীতিভরা চোখে প্রভাত স্ত্রীর দিকে তাকায়। তারপর হেসে বলে, 'ধর আমি মারা গেলাম। আর আমাকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করতে এসেছিলেন তুমি তার হাতে পড়লে। তখন তোমার একেবারে অন্যরকম চেহারা হয়ে যাবে। চালচলন ধরনধারণ সব আলাদা। শাড়ির রং, গয়নার প্যাটার্ন সব বদলে যাবে। তখন স্বামীকে কাছে বসে খাওয়াতে পারবে। কিন্তু যদি আগে না খেয়ে নাও, বেলা তিনটের আগে পেটে দানা পড়বে না। আমি দু-একজন ডাক্তারকে জানি কি না।'

ইভা ফের ধমকে ওঠে, 'কি আবোল তাবোল যা তা সব বলছ ? তুমি কি মদ ছেড়ে গাঁজা ধরেছে নাকি আজকাল ?'

স্বামীর এ ধরনের কথাবার্তায় ইভার মাঝে মাঝে ভারি চিন্তা হয়। এরকম নিষ্ঠুর হাসি-ঠাট্টা করে কেন প্রভাত ? তবে কি

ইভাকে সে আর ভালোবাসেনা ? ইভার বয়স বেশি বলেই কি সে তাকে অবজ্ঞা করে ? প্রভাতের চেয়ে বয়সে দু'বছরের বড় হওয়া ইভার পক্ষে বিচিত্র নয়। কিন্তু দেখতে তো আর তাকে তেমন দেখায় না। প্রভাতের মত লম্বা চওড়া জোয়ান পুরুষের কাছে ইভাকে এখনো ছোট পাখিটির মতই মনে হয়। নাকি প্রভাতের ভালোবাসার ধরনই এই। আদর করে সে যখন বুকে চেপে ধরে, তখনো ব্যথা না দিয়ে ছাড়েনা। তেমনি তার হাসি-ঠাট্টা সোহাগ ভালোবাসার কথার মধ্যেও কিছু না কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা না থেকে যায় না। ইভার মনে পড়ে, অতুলের স্বভাব অন্যরকম ছিল। নরম প্রকৃতির মানুষ বলে ইভা নিজেও তাকে কত ঠাট্টা তামাসা করেছে। তার জন্যে এখনো মাঝে মাঝে দুঃখ হয় ইভার। কিন্তু প্রভাতের সামনে কিছুতেই তার নাম মুখে আনেনা, অতুলের প্রসঙ্গ সতর্কভাবে এড়িয়ে যায়। তা না করলে প্রভাত যে খুশি হবে না তা কি আর ইভাকে কারো বলে দেওয়ার দরকার হবে ? পুরুষ মানুষকে চিনতে তার কি আর এখনো কিছু বাকি আছে ?

সেদিন রন্টু আর বুলাকে ঘুম পাড়িয়ে পিসি-শাশুড়ীর ভাত-তরকারী বেড়ে দিয়ে নিজেও খেতে বসেছিল ইভা, ঝন ঝন করে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

পিসিমা চারুবালা বললেন, দেখতো, 'প্রভাত এল নাকি ? এক একদিন তো এসময়ে আসে। 'রন্টু, ও রন্টু, যাতো দোরটা খুলে দিয়ে আয়। তোর বাবা এল বুঝি।'

কিন্তু আট বছরের রন্টু একটু বাদে লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে বলল, 'বাচ্চুদা এসেছে, বাচ্চুদা।'

ইভা রন্টুর পিছনে বাচ্চুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে ভুলে গেল। একটু বাদে বলল, 'বাচ্চু, তুই যে এখানে? তুই কী করে এলি?'

বাচ্চু হেসে বলল, 'কেন, বাসে করে এলাম। তুই সেকসনে চলে এসেছি মা। সেভেনটি নাইনে শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে চোখ বুজে যে কোন গাড়ীতে উঠে বসলেই হল। বাস ট্রাম সবই তো মাণিকতলা দিয়ে যায়। মোড়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাস কর, আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। জিজ্ঞেস করলেই ভাববে বাঙাল। মফঃস্বলের গেঁয়ো লোক। তার চেয়ে যদি একটু খোঁজাখুঁজি করতে হয় সেও ভালো।'

ইভা হাসি চেপে বলল ,'যাক তোমাকে আর বাহাতুরি দেখাতে হবে না। নেয়েছিস? খেয়েছিস? চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না।'

বাচ্চু বলল, 'সেজন্যে ভেব না, মা। একবেলা কেন, একটানা পুরো তুদিন আমি না খেয়ে থাকতে পারি। তাতে কোন কষ্ট হয় না আমার।'

চারুবালা গম্ভীর মুখে বললেন, 'এসেছ যখন খেতে বসে যাও। ভাত, মাছ, তরকারি সবই তো আছে।'

ইভা বাধা দিয়ে বলল, 'না না, এখনই খেতে বসে কাজ নেই। বাথরুমের চৌবাচ্চায় জল ধরা আছে। যা, চান করে আয়। এই গরমে না নাইলে মানুষের শরীর ভালো থাকে?'

কোনরকমে বাকি খাওয়াটুকু সেরে নিয়ে ইভা উঠে পড়ল। তেল গামছা আর প্রভাতের একখানা ধুতি বের করে দিল বাচ্চুকে। রণ্টু আর বুলার আনন্দের সীমা নেই। তারা কেবল বাচ্চুর পিছনে পিছনে ঘুরছে। কৌতূহলভরা চোখে তাকাচ্ছে

তার দিকে। এই ছেলেটির সঙ্গে তাদের যে কি সম্পর্ক তা এখনো পরিষ্কার করে বুঝতে পারেনি। তাই কৌতূহল আরো বেশি।

নাওয়া হয়ে গেলে বাচ্চুকে আসন পেতে খেতে দিল ইভা। প্রভাতের জন্যে যে ভাত তরকারি বাড়া ছিল তার খানিকটা এনে দিল। এত বেলায় প্রভাত আর আসবে না। নিশ্চয়ই অভ্যাসমত হোটেলে-টোটেলে খেয়ে নেবে।

কাছে বসে ছেলের খাওয়া দেখতে দেখতে ইভা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁরে বাচ্চু, আসার সময় তোর দাদুকে বলে এসেছিস তো?'

বাচ্চু হাসি মুখে বলল, 'তাঁকে বলে এলে তিনি কি আসতে দিতেন?'

ইভা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাহলে তুই পালিয়ে এসেছিস বল?'

বাচ্চু এ কথার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল।

ইভা বলল, 'ছিঃ, মোটেই ভালো করনি। কেন তাঁকে না বলে পালিয়ে এলে?'

মায়ের ধরনধারণ দেখে বাচ্চু অবাক হয়ে গেল। সে ভেবেছিল, তাকে দেখেই মা খুসি হবে। সে কীভাবে এসেছে, পালিয়ে এসেছে, না বলে এসেছে তা নিয়ে নিশ্চয়ই মা মাথা ঘামাবে না। দুদিন আগে যাকে কাড়াকাড়ি করে আনতে গিয়েছিল, সে নিজেই এসে ধরা দিয়েছে। এতে মা আনন্দ পাবে। বাচ্চু যে দাদুর চেয়ে মাকেই বেশি ভালোবাসে, তার মা পালিয়ে গিয়ে আর একজনকে বিয়ে করা সত্ত্বেও বাচ্চু যে তার কাছেই বেশি থাকতে চায় সঙ্গে সঙ্গে তারও প্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু মায়ের কথাবার্তার ধরন দেখে বাচ্চু বড় হতাশ হয়ে গেল।

একটা অসহায় চাপা রাগ, আক্রোশ আর দুঃখ জমে উঠতে লাগল তার মনে।

বাচ্চু মাথা নিচু করে খেতে খেতে হঠাৎ বলে উঠল, 'কেন, পালিয়ে এসেছি তো কী হয়েছে? পালিয়ে তো তোমরাও একদিন এসেছিলে। আমি সব জানি। ঠাকুরমার কাছে আমি সব শুনেছি। আমি তো তবু শুধু বাসভাড়াটা নিয়ে চলে এসেছি। আর তোমরা যে—'

এতটুকু ছেলের মুখে ওই সব কথা শুনে ইভা হতভম্ব হয়ে গেল। ছি ছি, তার মুখের ওপর ওই পাকা পাকা কথাগুলি কী করে বলতে পারল বাচ্চু! লজ্জা করল না? ভয় করল না? শাশুড়ী যে তার কী সর্বনাশ করে গেছেন তা ভেবে ইভার কান্না পেল। ছেলেটাকে তো কোন সৎশিক্ষা দিয়ে যানইনি বরং খারাপ যা শেখাবার শিখিয়েছেন। অতটুকু ছেলের মনকে মাতৃবিদ্বেষে ভরে দিয়ে গেছেন। মায়ের কলঙ্কের কথা মুখস্থ করিয়ে গেছেন। এর চেয়ে বড় শত্রুতা আর কেউ কি করতে পারে?

খেয়ে উঠে মুখ মুছতে মুছতে বাচ্চু বলল, 'তোমার যদি ভালো না লেগে থাকে আমি চলে যাচ্চি মা, আমি এক্ষুনি বিদায় হচ্ছি।'

ইভা শাসনের ভঙ্গিতে ছেলেকে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ। তোমার বড় বাড় বেড়ে গেছে বাচ্চু। আহ্লাদে আহ্লাদে সবাই তোমার মাথা খেয়ে দিয়েছেন। যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছ তুমি।'

চারুবালা ফোড়ন কাটলেন, 'ওর আর দোষ কি। ও যেমন দেখবে তেমন তো শিখবে, যেমন শুনবে তেমন তো বলবে।'

ইভা সে কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগল, 'আমার এখানে থাকলে তোমার ওই বেয়াড়াপনা চলবে না। যেমন লেখাপড়া

শিখবে, তেমনি সভ্যতা ভব্যতাও শিখতে হবে। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যদি ভদ্রতা না শেখ, তাহলে জীবনে করবে কী শুনি?'

রণ্টু এসে উদ্ধার করল বাচ্চুকে। হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এসো বাচ্চুদা, চল—আমরা খেলি গিয়ে। কত বড় একখানা মোটরগাড়ী বানিয়েছি দেখবে এসো।'

দৃশ্যটা ইভার বড় ভালো লাগল। দুটি ছেলে দুটি ভিন্ন পুরুষের হলেও, দুজনই ইভার রক্তমাংস মায়ামমতা দিয়ে গড়া। ওদের মধ্যে যদি হিংসা দ্বেষ না থাকে, ওরা যদি একজন আর একজনকে ভালোবাসে, তাহলে কি সুখেরই না হবে।

হঠাৎ অখিলবন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল ইভার। বাচ্চুকে না দেখতে পেয়ে তিনি নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছেন। বুড়ো ভদ্রলোকের দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। তাঁর কাছে তো ওই বাচ্চুই একমাত্র হাতের লাঠি, একমাত্র অবলম্বন। বৃদ্ধ শ্বশুরের কথা ভেবে ভারি উদ্বেগ বোধ করল ইভা।

একখানা পোস্টকার্ড আনিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি ছেড়ে দিল। দোষটা যাতে বাচ্চুর ওপর খুব বেশি না চাপে, আবার ইভাকেও অখিলবন্ধু ভুল না বোঝেন, সে দিকে লক্ষ্য রেখে ইভা খুব বিনীত এবং কোমল ভাবে লিখল। 'ঠাকুরমার জন্যে মন কেমন করছিল বাচ্চুর। একা একা কিছুতেই ওখানে থাকতে পারছিল না। তাই হঠাৎ ও আমার কাছে চলে এসেছে। ভয়ে বোধহয় আপনাকে বলে আসতে পারেনি। আপনি ওর জন্যে কোন চিন্তা করবেন না। দুচার দিন পরে ওকে আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে রেখে আসব, না হয় ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। এই বয়সে একা একা আপনাকে দিন কাটাতে হচ্ছে। সে কথা যত

ভাবি মন তত খারাপ হয়। আমাদের হাতে আর তো কোন শক্তি নেই। শুধু ভাবতেই পারি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।' ইতি—বিনীতা ইভা।

চিঠিখানা লিখে ইভা খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। যত দোষঘাট করেছে, এই চিঠিতে তার অনেকখানি যেন প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। শ্বশুরও তাকে কম নিন্দামন্দ, কম গালিগালাজ করেন নি, কম অভিশাপ দেননি। সেই শ্বশুরকে ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরে নিজের উদারতায় ইভা নিজেই খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে কারোরই অকল্যাণ চায় না, কারোরই অনিষ্ট করতে চায় না। সকলেই শান্তিতে থাকুক। সকলেরই মঙ্গল হোক।

বিকালের দিকে হঠাৎ প্রভাত এসে উপস্থিত। সাধারণত এ সময়ে সে বাড়ি ফেরে না। আজ এদিককার প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেছে। তাই খেয়াল হয়েছে বাড়ির লোকজনের একবার খোঁজ নিয়ে যাওয়ার। বাচ্চুকে চোখে পড়ায় সে প্রথমে একটু বিস্মিত হয়, তারপর হেসে বলল, 'আরে, তুমি এসে কখন জুটলে? বেশ, বেশ। নরক এবার সত্যিই গুলজার হ'ল তাহলে।'

ইভা প্রতিবাদ করে উঠল, 'ও আবার কি ধরনের কথা তোমার! নরক গুলজার আবার কি!'

প্রভাত বলল, 'কি করব বল। আমি তোমার মত অমন মেপেজুপে কথা বলতে পারিনে। যা মুখে আসে তাই বলে ফেলি।'

ইভা আর কথা বাড়াল না।

খানিকক্ষণ বাদে চা খেয়ে নিয়ে প্রভাত বাচ্চুকে ডেকে তার পিঠে হাত রেখে বলল, 'কি বাবাজী, বিকেল বেলাটা বাড়িতেই

বসে থাকবে, না গাড়িতে বেরোবে আমার সঙ্গে ?' বাচ্চু তো এক পায়ে খাড়া। সে তো এই জন্যেই এসেছে। ট্যাক্সিতে করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াতে পারলে আর কি চায় সে।

বাচ্চু খুশি হয়ে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গেই যাব কাকাবাবু।'

রন্টু আর বুলাও সঙ্গে যাবার জন্যে বায়না ধরল। কিন্তু ইভা ধমক দিয়ে নিরস্ত করল তাদের, 'তোরা কোথায় যাবি এখন ? পড়তে বসতে হবে না ?'

রন্টু বলল, 'বাচ্চুদা কি পড়বে না, মা ?'

'বাচ্চু বাড়ি গিয়ে পড়বে। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, বেড়িয়ে টেড়িয়ে যাক।'

রন্টু বলল, 'যাবে কেন মা ? বাচ্চুদা এখানে থাকবে। আমাদের বাড়ি কি ওর বাড়ি না ?'

এ-কথার জবাব দেওয়া অত সহজ নয়। ইভা কি বলবে, হঠাৎ ভেবে পেলনা।

প্রভাত হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই ওর বাড়ি। তোমার বাচ্চুদার খুব একটা সুবিধে হয়ে গেছে। ওর দুটো বাড়ি। একটা বাবার, একটা মার।

ইভা ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ, ওসব কি হচ্ছে শুনি ? তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান হবে না ?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিল বাচ্চু। হাফ সার্ট, হাফ প্যান্টে ওকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে।

ইভা স্বামীকে আড়ালে ডেকে বলল, 'যেমন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ, তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে এনো কিন্তু। রাত দুপুর কোরো না, সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে দিয়ো।'

প্রভাত তেমনি কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'পৌঁছে দেবনা কি ওকে বারে নিয়ে তুলব? ওর কি সেই বয়স হয়েছে? যখন হবে, তখন কথাটা ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখতে হবে।'

ইভা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওসব কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? ও না তোমার ছেলে?'

প্রভাত বলল, ছেলে না হলেও 'ছেলের মত বইকি। কিন্তু জানো তো, প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ। বাচ্চুর অবশ্য এখনো ষোল হয়নি, কিন্তু গোঁফটোফের যা বাহার দেখছি তাতে ষোল বলে ইজিলি চালিয়ে দেওয়া যায়। ওকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দিতে তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে ইভা, তাহলে অবশ্য ওকে নিতে চাইনে।'

প্রভাত হেসে স্ত্রীর দিকে তাকাল। তার হাসির মধ্যে কতখানি কৌতুক কতখানি বিদ্রূপ রয়েছে ঠিক যেন বুঝতে পারল না ইভা। স্বামীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল—'ছিঃ, অমন বিশ্রী ঠাট্টা করতে নেই। তোমাকে বিশ্বাস করব না তো করব কাকে? আমার আর কে আছে?'

একটু পরে বাচ্চু প্রভাতের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ইভা রন্টু আর বুলাকে পড়াতে বসিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। এ বেলার জন্যে ভাত আর দু একটা তরকারি রাঁধলেই চলবে। কিন্তু এই রান্নাটুকু করবারও আজ জো রইলনা ইভার। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, ইভাদের মত সাধারণ সংসারে কোন ঘটনাই ঘটে না। কিন্তু এক একদিন তার ব্যতিক্রম ঘটে। বেনোজলের মত যত রাজ্যের ঘটনা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আজও তাই হল।

ইভার পিসি-শাশুড়ী এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, 'ইভা, বারাসত থেকে অখিলবাবু এসেছেন।'

ইভা প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বলল, 'অখিলবাবু? কেন? তিনি কেন এত রাত্রে এলেন? তিনি তো এখানে কোনোদিন আসেন না।'

চারুবালা বললেন, 'কেন এসেছেন তা কি ক'রে বলব? বাচ্চুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। বোধ হয় তার খোঁজেই এসেছেন।'

ইভা আঁচলে ভিজে হাতটা আস্তে আস্তে মুছল। সেই ফাঁকে শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে মনে মনে তৈরী হ'তে লাগল। আগে যতই দোষ ত্রুটি করে থাক, বাচ্চুর ব্যাপারে তার কোনই দোষ নেই। সে তার ছেলেকে জোর করে নিয়ে আসেনি। বাচ্চু নিজেই পালিয়ে এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে সে কথা জানিয়েও দিয়েছে ইভা। সে চিঠি অখিলবন্ধু কালই পেয়ে যাবেন। এই কয়েক ঘণ্টার জন্যে সেই সবুরটুকু সইলনা তাঁর?

ইভা শাড়ি বদলাল না। অখিলবন্ধুর কাছ থেকে নিন্দামন্দ তিরস্কারের জন্যে তৈরি হয়েই সে এসে বসবার ঘরে ঢুকল।

অখিলবন্ধু হাতলহীন একখানা কাঠের চেয়ারে শক্ত কাঠের মতই বসেছিলেন। হাতে একখানা বেতের বাঁধানো লাঠি। ইভার মনে পড়ল, লাঠিখানা রথের মেলা থেকে অতুলই তার বাবাকে কিনে দিয়েছিল।

ইভা আঁচলে হাত মুছে অখিলবন্ধুর সামনে এসে দাঁড়ালে, তিনি প্রথমে খানিকক্ষণ কোন কথা বললেন না। স্থিরদৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ

ছাড়া অন্ত কিছু ছিলনা। একটু চুপ করে থেকে ইভা বলল, 'আপনি এই রাত্রে কষ্ট করে এসেছেন। আমি কিন্তু বাচ্চু আসার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে একটা চিঠি পোস্ট করে দিয়েছি। কালই পেয়ে যাবেন।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'চিঠি? কিসের চিঠি?'

ইভা বলল, 'বাচ্চু যে পালিয়ে এসেছে, সেই খবরই আমি আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম।'

অখিলবন্ধু শান্তভাবে বললেন, 'পালিয়ে এসেছে? না তোমরা ওকে ষড়যন্ত্র ক'রে আনিয়ে নিয়েছ?' তাঁর বলবার ভঙ্গি শান্ত হলেও কথার ভিতর থেকে তীব্র ঘৃণা আর অবিশ্বাস ঝরে পড়ল।

ইভার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, 'আপনি কি বাড়ি বয়ে আমাদের অপমান করবার জন্যে এসেছেন? কী বলতে চান আপনি শুনি? নিজের ছেলেকে আমি চুরি করে এনেছি?'

অখিলবন্ধু এ কথার কোন সরাসরি জবাব না দিয়ে বললেন, 'তুমি যে কত সতী, কত সাধ্বী তা আমার জানা আছে।'

ইভা বলল, 'তাই বলে নিজের ছেলেকে আমি চুরি করে আনব? আমি আনলে, চুরি করে আনতাম না, আপনাকে জানিয়েই আনতাম। সেইদিনই তাকে বলতাম চলে আয় আমার সঙ্গে। সে তো আসার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। সে আপনাকে ভালোও বাসে না, আপনার কাছে থাকতেও চায় না।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'চায় কি না চায় তার বিচার জায়গামতই হবে। বাচ্চুকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ এনে দাও। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

ইভা বলল, 'বাচ্চু এখন এখানে নেই। আর আপনি যদি ওভাবে কথা বলেন, আপনি কিছুতেই তাকে পাবেন না।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'বটে! তোমার এত স্পর্ধা, আমার বংশের ছেলেকে তুমি এই নরকের মধ্যে আটকে রাখতে চাও? জানো, আজ আমি থানায় গিয়ে ডায়েরি করে এসেছি। ভালোয় ভালোয় ওকে যদি ছেড়ে না দাও, পুলিস এসে দুজনকেই হাতে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে।'

ইভা মোটেই ভয় পেল না। শান্ত কিন্তু বেশ স্পষ্ট গলায় বলল, 'বেশ তো, আপনি তখনই বাচ্চুকে এসে নেবেন। পুলিশের সাহায্যেই নেবেন।'

অখিলবন্ধু লাঠিতে ভর করে দাঁড়ালেন। তখনো তিনি রাগে থর থর করে কাঁপছেন। বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। তোমাদের যখন তাই ইচ্ছা, দারোগা পুলিসই আসবে।'

তিনি আর দাঁড়ালেন না। দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় গিয়ে নামলেন। ইভা তাঁকে ডেকে ফেরাল না, বাধা দিল না। স্থিরনিশ্চল হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

চারুবালা দরজার আড়াল থেকে সবই শুনছিলেন। এবার সামনে এসে বললেন, 'কী হয়েছে, ইভা?'

তাঁর যে কানে যেতে কিছু বাকি নেই, আড়ি পেতে সবই শুনে নিয়েছেন, তা ইভা টের পেয়েছে। তবু পিসি-শাশুড়ীর এই ধরনের ভালোমানুষিতায় সে খুবই বিরক্ত বোধ করল। জেনে শুনে এই ন্যাকামির কি মানে হয়?

ইভা বলল, 'কিছুই হয়নি। আপনি ঘরে যান।'

চারুবালা বললেন, 'নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারছি কই ইভা। কি সব শুনলাম, থানা পুলিস—।'

ইভা তেমনি অপ্রসন্ন সুরে বলল, 'ওসব নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

এবার চারুবালাও বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'ভাবা না ভাবা তো তোমার হুকুমে হবেনা বাছা। প্রভাতকে আবার যদি এসব ব্যাপার নিয়ে থানা পুলিসে জড়িয়ে পড়তে হয়, সে কি কম অশান্তি। তাতে টাকা পয়সাও তো লাগবে। আমি তা কিছুতেই হতে দেবো না।'

ইভা এ কথার কোন প্রতিবাদ না করে সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘর মানে ছোট লম্বা এক ফালি ঢাকা জায়গা। ইভা যদি একটু মোটাসোটা হত, দরজা দিয়ে ঢুকতে বেরোতে কষ্ট হত তার। কিন্তু সে ছোটখাট ছিপছিপে চেহারার বলে কোন অসুবিধা হয় না। যাওয়ার সময় উনুনের ওপর থেকে কড়াটা নামিয়ে গিয়েছিল তাই তরকারি পুড়ে যায়নি, কিন্তু আঁচ তো মিছিমিছি নষ্ট হয়ে গেল। অকারণে কয়লা পুড়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে বড় অস্বস্তি যেন এই মুহূর্তে আর নেই।

ইভা রান্নার ঘটি থেকে আরো খানিকটা জল ঢেলে দিল কড়ায়। খুন্তি দিয়ে নাড়তে লাগল আলু কুমড়োর তরকারিটা। একটু আগের সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে উলটে পালটে দেখল। অনেক অপবাদ, অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সে সহ্য করেছে, আর নয়। মা হয়ে নিজের ছেলেকে চুরি করে আনার অপবাদ সে কিছুতেই সহ্য করবে না। বাচ্চুকে সে ফিরিয়ে দেবে না। তার ওপর নিজের স্বত্ব বজায় রাখবার জন্যে ইভা থানা-পুলিশ করতে হয় করবে,

হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়তে হলেও লড়বে। বুড়ো শ্বশুর তাকে যথেষ্ট অপমান করেছেন। এবার তার শোধ নেবে ইভা। ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়বে না। শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়বে।

প্রভাত সত্যিই আজ আর বেশি রাত করল না। ন'টার মধ্যেই ফিরে এল। ইভার মনে হল, বাচ্চু সঙ্গে থাকায় আজ আর সে মদ খায়নি। লুকিয়ে-চুরিয়ে যদি-বা কিছু খেয়ে থাকে সেও অল্প-স্বল্প।

আস্তে আস্তে স্বামীর কাছে সবই খুলে বলল ইভা। অখিলবন্ধু তাকে যতটা না কড়া কথা বলেছেন, অপমান করেছেন, তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলল।

শুনতে শুনতে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রভাত। হাতটা মুঠো পাকিয়ে বলল, 'আমি সামনে থাকলে শালার বুড়োকে দু'চার ঘা লাগিয়ে দিয়ে তবে ছাড়তাম।'

ইভা বলল, 'থাক থাক, ছেলেপুলের সামনে আর মুখ খারাপ করতে হবে না তোমার। ঘরের মধ্যে বীরত্ব দেখিয়ে কোন দরকার নেই। কার্যকালে দেখা যাবে, কার কতখানি বুকের পাটা। তখন যেন পিছিয়ে যেয়ো না।'

প্রভাত বলল, 'আরে না না। কোন কাজে আমাকে কখনো পেছ-পা হতে দেখেছ ? আমার স্বভাব চরিত্র জানতে তো তোমার কিছু বাকি নেই।

ইভা ভারি লজ্জা পেল। বাচ্চু বসে আছে সামনে। সে তো আর ছোটটি নেই। সে এখন সব বোঝে। আগেকার সব কাহিনীই সে শুনেছে, সবই জানে। তার সামনে ওভাবে কথাটা না বললেই পারত প্রভাত।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বাচ্চুকে একান্তে ডেকে নিল ইভা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বাচ্চু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

বাচ্চু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলছ মা?'

ছেলেকে আরো কাছে টেনে নিল ইভা। মাথায় বাচ্চু তাকে এখনই বেশ খানিকটা ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য গায়ে-পায়ের দিক থেকে একেবারে তাল-পাতার সেপাই।

ছেলের পিঠে সস্নেহে হাত রাখল ইভা, তারপর মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুই আমার, না তোর দাদুর?'

বাচ্চু হঠাৎ এ ধরণের প্রশ্ন মার কাছ থেকে আশা করেনি। জবাব দিতে একটু সময় লাগল। দাদুর মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। লম্বাটে শীর্ণ মুখ। প্রায়ই তাতে দু' তিনদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমে থাকে। গাল দুটো ভাঙা। দাদুকে ভারি বেচারা বেচারা দেখায়।

কিন্তু বাচ্চুর মা তার চোখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি কোমল গলায় ফের জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি করে বল বাচ্চু, তুই কার? তোর দাদুর, না আমার?'

বাচ্চু বলল, 'আমি তোমার মা, পুরোপুরি তোমার। আর কারো নয়।'

ইভা ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'বাঁচলুম। দারোগা-ইন্‌স্পেক্টরের সামনে, কি জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোকে যদি একথা কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুই ঠিক এই কথাই বলবি তো? বলবি তো তুই আমাকে ছাড়া আর কাউকে চাস্‌ নে? আমাকে ছাড়া আর কারো কাছে তুই থাকবিনে?'

বাচ্চু বলল, 'তাই বলব মা। নিশ্চয়ই বলব।'

ইভা খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে আর আমার কোন ভাবনা নেই। তুই নিজে যদি ইচ্ছা করে আমার কাছে থাকিস, পৃথিবীতে কারো সাধ্য নেই তোকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়।'

ইভা নিজেই যে তার শিশুপুত্রকে ছেড়ে এসেছিল, সে-কথা এই মুহূর্তে তার কিছুতেই মনে পড়ল না।

ছয়

আজও অনেক রাত পর্যন্ত অখিলবন্ধুর ঘুম এলো না। কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে জমাখরচের খাতা খুলে বসেছিলেন। কিন্তু লিখতে মন লাগল না। রুটি-তরকারি বাড়া ছিল। কিন্তু কিছুই খেলেন না অখিলবন্ধু। ঢকঢক করে শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর রাজ্যের অন্ধকার এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তাঁর মনে হল, যেন সীমাহীন অরণ্যের মধ্যে তিনি শুয়ে আছেন। চারদিকে বড় বড় দাঁতওয়ালা, শিংওয়ালা হিংস্র জন্তুর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেউ তাঁকে খাচ্ছে না। দাঁত দিয়ে কি নখ দিয়ে চিরে চিরে ফেলছে না। তারা জানে, যে-কোন মুহূর্তেই অখিলবন্ধুকে তারা মেরে ফেলতে পারে। সেইজন্যেই যেন তাদের তাড়াতাড়ি করবার কোন গরজ নেই। নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়েও অখিলবন্ধু ভারি নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। যেন এক অজানা দেশের অচিনপুরীতে তিনি এসে পড়েছেন। এখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। এখানে তিনি সম্পূর্ণ অসহায়, নিঃসম্বল, নিঃসম্পর্কীয়। বুকের ভিতরটা বড় হাহাকার করতে লাগল অখিলবন্ধুর। স্ত্রী আর পুত্রের নাম ধরে বলতে লাগলেন, 'এই শূন্য পুরীতে আমাকে একা ফেলে রেখে কোথায় চলে গেলে তোমরা? আমি যে একা একা থাকতে পারিনে।'

কিন্তু ভোরের আলোয় অখিলবন্ধুর সমস্ত দুর্বলতা মিলিয়ে

গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর বাড়ি, জমি, বাগান আর দরিদ্র অনাথ ছেলেদের জন্যে তাঁর স্ত্রীর হাতে গড়া স্কুলটা।

এই সেদিন তিনি নতুন সাইনবোর্ডখানা টাঙিয়ে দিয়েছেন। তার রঙীন অক্ষরগুলি এখনো চক্‌চক্ করছে। এই স্কুলকে আরও বড় করে তুলবেন অখিলবন্ধু। একটা হাইস্কুল করবার মত জায়গা যথেষ্ট পড়ে রয়েছে। সেখানে তিনি স্ত্রী-পুত্রের স্মৃতিকে অমর করে রাখবেন। গরীব অনাথ ছাত্রেরাও চিরকাল লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাবে। এই সব কর্তব্য এখনো বাকি রয়ে গেছে অখিলবন্ধুর। এসব শেষ করবার আগে তিনি মরতে পারবেন না। আর বাচ্চু। হঠাৎ পৌত্রের কথাটা মনে পড়তেই অখিলবন্ধুর বুকে কিসের একটা ঘা লাগল। তার বংশের দুলালকে একজন সামান্য স্ত্রীলোক ছলে-বলে কেড়ে রেখেছে, একথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। যেমন করেই হোক, ওকে উদ্ধার করে আনতে হবে। নিজের রুচি, বুদ্ধি ও আদর্শ অনুযায়ী তাকে মানুষ করে তুলতে হবে। এই কর্তব্য অখিলবন্ধু যদি পালন না করেন, কে করবে?

দিনের আলো তাঁর মধ্যে নতুন তেজ, জেদ, আশা এবং আশ্বাস নিয়ে এল। তিনি দিনের শুরুতে যথারীতি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বর তাঁকে বল দিন, যা অসৎ, যা অন্যায় তার সঙ্গে সংগ্রাম করবার শক্তি দিন।

বিমল ডাক্তারের বাড়িতে রোজের দুধটা দিয়ে আসতে গিয়ে তিনি নিজে থেকেই তাঁর পারিবারিক সমস্যার কথাটা পাড়লেন। বাচ্চুর খোঁজে ইভাদের বাড়িতে যাওয়ার পর তার সঙ্গে যে সব কথা-কাটাকাটি তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, তাঁর অনুরোধসত্ত্বেও বাচ্চুকে তারা তাঁর হাতে তুলে দেয়নি বরং লুকিয়ে রেখেছে, সব খুলে বললেন।

চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'বুঝলেন ডাক্তারবাবু, আমি সহজে ছাড়ব না, আমি মামলা করব। মামলা করে ওই ডাইনীর হাত থেকে আমি আমার নাতিকে উদ্ধার করে আনব। ওদের জেলে যেতে হবে।'

বিমলবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই এই ব্যাপারটায় দুঃখিত হয়েছিলেন। অখিলবন্ধুর মত একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষের ভাগ্যে বারবার এমন বিড়ম্বনা ঘটায় তাঁর ওপর বিমলবাবুদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার কথাটা তাঁদের মনঃপুত হল না।

বিমলবাবু বললেন, 'আমার যদি কথা শোনেন অখিলবাবু, তাহলে ওসব ঝামেলার মধ্যে মোটেই যাবেন না। বুঝিয়ে শুঝিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন। বাচ্চুকে কদিন আর তাঁরা আটকে রাখতে পারবেন। তাছাড়া, পরের সংসারে বাচ্চুর নিজেরও বোধ হয় বেশিদিন আর ভালো লাগবে না। ও যেমন পালিয়ে গিয়েছিল, তেমনি একদিন পালিয়েই চলে আসবে। আপনাকে ভাবতে হবে না।'

কিন্তু এই হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শ অখিলবন্ধুর তেমন ভালো লাগল না। তিনি বেশিদিন অপেক্ষা করতে রাজী নন। যত তাড়াতাড়ি পারেন ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবার জন্যে অখিলবন্ধু বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আর কতদিনই বা তিনি বাঁচবেন। কর্তব্য শেষ করবার জন্যে কতকালই বা অপেক্ষা করতে পারবেন তিনি? তার চেয়ে যে কাজ হাতের সামনে আছে তা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা ভালো। যা উচিত বলে মনে করেন তা করে ফেলতে পারলেই মনে শান্তি আসে।

এ ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শের চেয়ে উকিলের পরামর্শই অখিলবন্ধুর কাছে সমীচীন বলে মনে হল। উকিলদের মধ্যে মনোরঞ্জন সেনের সঙ্গে তাঁর অনেক দিন ধরে আলাপ পরিচয় আছে। নিজের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার নিয়েও তিনি কয়েকবার তাঁর কাছে গেছেন। তাঁকে দিয়ে কাজকর্মও করিয়েছেন দু'তিনবার।

অখিলবন্ধু মনোরঞ্জনবাবুর সেরেস্তায় এসে উপস্থিত হলেন। রাস্তার ধারে একতলা বাড়ি। সামনে খোলা নর্দমা। ঘরের মধ্যে খান দুই বেঞ্চ পাশাপাশি পাতা। তাতে কয়েকজন মক্কেল বসে বসে বিড়ি টানছে। একপাশে টেবিল, চেয়ার, তক্তপোষ। তার পিছনে আইনের বইয়ে ভরা পুরোন কাঠের আলমারি। তক্তপোষের ওপর হাতবাক্স সামনে নিয়ে মুহুরী ঘাড় গুঁজে কী যেন লিখে চলেছে। মনোরঞ্জনবাবু টেবিল চাপড়ে জোর গলায় মক্কেলকে আইনের জটিলতা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। অখিলবন্ধুকে দেখে গলা নামিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'এই যে বিশ্বাস মশাই, আসুন আসুন। কী ব্যাপার বলুন দেখি? এদিকে তো আপনার বড় একটা শুভাগমন হয় না।

অখিলবন্ধু এ-কথার জবাবে মৃদু একটু হাসলেন। অন্য মক্কেলদের কথাবার্তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর মুখ খুললেন না। মিনিট পনের বাদে মনোরঞ্জনবাবু অখিলবন্ধুকে বললেন, 'এবার আপনার ব্যাপারটা বলুন বিশ্বাসমশাই।'

অখিলবন্ধু শান্তভাবে বললেন, 'আগে ওঁদের কাজ হয়ে যাক মনোরঞ্জনবাবু, তারপরে বলব। আমার তেমন তাড়া নেই। আমি বরং অপেক্ষা করি।

অখিলবন্ধুর এই সৌজন্যে মনোরঞ্জনবাবু খুশি হলেন। অখিলবন্ধু

তাঁর চেয়ে বয়সে অন্ততঃ বিশ বছরের বড়। মনোরঞ্জনের বয়স এখনো চল্লিশের নীচে। যদিও মাথা ভরতি টাকের জন্যে তাঁকে আরো খানিকটা বয়স্কই দেখায়। মনোরঞ্জন ভাবলেন কী প্রশান্তি আর প্রসন্নতাই না আছে অখিলবন্ধুর মনে। তিনি এখনো পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন, আমার যথেষ্ট সময় আছে, আমার জন্য ব্যস্ত হবার কারণ নেই।'

সবাই চলে গেলে অখিলবন্ধু নিজের সঙ্কটের কারণটা খুলে বললেন। মনোরঞ্জনবাবু সব শুনে গম্ভীরভাবে বললেন, 'দিন কয়েক অপেক্ষা করে দেখতে পারেন, আপোষে ওরা আপনার নাতিকে পাঠিয়ে দেয় কিনা। কিন্তু দেবে বলে তো মনে হয় না।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'কক্ষনো দেবেনা, আমি আমার ছেলের বউকে চিনি। তার কাণ্ডকারখানা আপনি নিজেও শুনেছেন মনোরঞ্জনবাবু। তার মত জাঁহাবাজ স্ত্রীলোক না করতে পারে এমন কাজ নেই। আমাকে জব্দ করবার জন্যে সে সব করতে পারে। আইন আদালতের শরণ নেওয়া ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। কিন্তু মামলা আমাকে করতেই হবে মনোরঞ্জনবাবু। তাতে যদি আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো। বাচ্চু আমার বিষয়-সম্পত্তির চেয়ে অনেক বেশি। আমার বংশের একমাত্র সন্তান। ওকে আমি অসৎসংসর্গে রেখে নষ্ট করতে পারিনে।'

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, 'কথাটা অবশ্য ভেবে দেখবার মত।'

অখিলবন্ধু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'সারাটা রাতভর আমি ভেবেছি মনোরঞ্জনবাবু। ভেবে স্থির করেছি, আমাকে দুর্বল হলে চলবেনা। বাচ্চুর মঙ্গলের জন্যেই আমাকে শক্ত হতে হবে। নাতির দখলী কিনারা হতে দেরি হয়ে যাবে। কারণ পুলিস যে এ

ধরনের কেস হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে করিৎকর্মা হয়ে উঠবে তেমন ভরসা করা যায় না।

অখিলবন্ধু মাথা নেড়ে বললেন, 'না না, আদালতেই যাব। আমি নিজেই ফরিয়াদী হয়ে সুবিচার চাইব। মন আমি স্থির করে ফেলেছি উকিলবাবু।'

মনোরঞ্জনবাবু বৃদ্ধের দৃঢ়তা আর জেদ দেখে বিস্মিত হলেন। এমন অবিচল চিত্ত মক্কেল খুব বেশি মেলেনা। এ ধরনের একরোখা মানুষ নিয়ে কাজ করে সুখ আছে। কারণ মামলা-মোকদ্দমাটা সত্যিই জেদের ব্যাপার। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার মত মনের জোর না থাকলে যুদ্ধে নামাই বিড়ম্বনা।

মনোরঞ্জনবাবু দেখে খুশি হলেন তাঁর মক্কেলের মনে যেমন বল আছে, ঘরেও তেমনি সম্বল নিতান্ত কম নেই।

'স্বত্ব নিয়ে ছেলের বউয়ের সঙ্গে মামলা করছি বলে পাড়াপড়শী অনেকেই হাসবে, আড়ালে আড়ালে টিটকিরি দেবে, তা দিক। আমি কিছুতে পিছপা হব না, আইনের কাছে আমি ন্যায়বিচার চাই। আমি তো বেআইনী কিছু করতে চাইনে। আমি সকলের কল্যাণ চাই। বাচ্চু মানুষ হয়ে উঠেছে মরবার আগে সেইটুকুই শুধু দেখে যেতে চাই আমি।'

মনোরঞ্জনবাবু ভরসা দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবেন, বিশ্বাস মশাই। আপনার বংশের ছেলে যদি মানুষ না হয় হবে কার?'

আদালতে না গিয়ে শুধু পুলিসের ওপরও নির্ভর করা যায়। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু নিজেই বললেন যে, তাতে এ ব্যাপারের সহজে কোন সুরাহা হবেনা।

অখিলবন্ধু সব ভার উকিলের ওপর দিয়ে বললেন, 'আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন।'

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার মত সৎ ধার্মিক মানুষের কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।'

ব্যারাকপুরের এস. ডি. ও-র কোর্টে মামলা দায়ের করে দিলেন মনোরঞ্জনবাবু। অখিলবন্ধুর পৌত্র শ্রীমান সমীরকুমার বিশ্বাস ওরফে বাচ্চুকে ইভা সরকার আর তার স্বামী প্রভাত সরকার অখিলবন্ধুর আইনসঙ্গত অভিভাবকত্ব থেকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গেছে। অখিলবন্ধু তাঁর আবেদনে পৌত্রের প্রত্যর্পণ দাবি করেন।

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, 'ইণ্ডিয়ান সেসন কোডের ৩৬২ ধারা। আপনি ভাববেন না, জেল জরিমানা দুইই হবে। যেমন বেয়াড়া স্ত্রীলোক উপযুক্ত সাজা হবে তার।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'তাই হোক, আমি তাই চাই।'

আদালত থেকে সমন জারি করা হলো ইভা সরকার আর তার স্বামী প্রভাত সরকারের ওপর। বাচ্চুকে নিয়ে তাদের হাজির হওয়া চাই।

শুনানীর দিন কোর্টের বারান্দায় দুপক্ষই মুখোমুখি হল। অখিলবন্ধুর সঙ্গে আর কেউ আসেনি। নিকট আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। কে আসবে। কামলা কিষাণদের মধ্যে কেউ কেউ আসতে চেয়েছিল। কিন্তু অখিলবন্ধু আনেননি। তিনি ধমক দিয়ে বলেছেন, 'কাজ কামাই করে তোদের তামাসা দেখতে আসতে হবেনা। আমি একাই পারব।'

পাড়াপড়শীদের মধ্যেও কেউ কেউ আসবার জন্যে আগ্রহ জানিয়েছিলেন। অখিলবন্ধু হাতজোড় করে তাদেরও নিষেধ করেছেন। বলেছেন, 'যদি সুদিন আসে, ভগবান যদি সেই দিন দেন, তাহলে বাচ্চুকে সঙ্গে করে আপনাদের প্রত্যেকের বাড়িতে নিয়ে যাব। সে দোরে দোরে গিয়ে আপনাদের প্রণাম করে আসবে। আদালতে গিয়ে কাজ নেই আপনাদের।'

অখিলবন্ধুর সঙ্গে কেউ আসেওনি, তিনি কাউকে আনেনওনি। শুধু উকিল মুহুরী সম্বল। তাঁরাও অন্য মক্কেলদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, অন্যতর মক্কেলকে আকর্ষণের জন্যে উদ্‌গ্রীব। অখিলবন্ধু বারান্দায় পাতা লম্বা বেঞ্চটার একটা ধার ঘেঁষে সঙ্কুচিত হয়ে চুপ করে বসে রইলেন। আদালতের সামনে লোকজনের ছুটোছুটি, পান-সিগারেটের দোকানের সামনে ভীড়, এক ভদ্রলোক দু-তিন জন লোককে ডাব খাওয়াচ্ছেন। বোধ হয় নিজের পক্ষের সাক্ষী। অখিলবন্ধু বসে বসে এই সংসার-লীলা দেখতে লাগলেন। যেন শুধু দেখতেই এসেছেন। আর কোন কাজ আর কোন উদ্দেশ্য নেই তাঁর।

হঠাৎ চোখ পড়ল অন্য পক্ষকে। তাঁর শত্রুপক্ষকে। যারা তাঁর আত্মীয় ছিল, একান্ত আপনজন ছিল তারাই আজ শত্রু। তারা দল বল নিয়ে এসেছে। বাচ্চু, ইভা, তার স্বামী প্রভাত, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছোকরা। বোধহয় ইয়ার-বন্ধু হবে। অখিলবন্ধুকে দেখে দেখে তারা খুব সিগারেট টানছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে।

অনেক দিন পরে বাচ্চুকে দেখতে পেয়ে অখিলবন্ধুর মন আবেগে আর্দ্র হয়ে উঠল। তিনি যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওকে ডেকে বললেন, 'বাচ্চু, বাচ্চু!' বাচ্চু চমকে উঠে মুখ ফেরাল। অখিলবন্ধুকে

দেখেই তাড়াতাড়ি সরে ইভা আর প্রভাতের আড়ালে চলে গেল।

অখিলবন্ধু নিজের মনে বললেন, 'ওরে বেইমান, ওরে নেমকহারাম! আমার বংশের ছেলে তুই, আমার রক্তের ধারা তোর শিরায় শিরায় বইছে, আর আমার ওপর তোর এত বিদ্বেষ! দুধকলা দিয়ে কী সাপই পুষেছি ঘরে। ছিলি বংশধর, হলি বিষধর, এখন আমাকেই ছোবল মারতে শুরু করেছিস।'

ইভা যেমন সপরিবারে এসেছে, অখিলবন্ধুর স্ত্রী আর ছেলে যদি বেঁচে থাকত, তিনিও তাদের নিয়ে আসতে পারতেন। তাঁকে আর এমন নিঃসঙ্গভাবে আসতে হত না এখানে। এর পর নিজের মনেই হাসলেন অখিলবন্ধু। তাঁর ছেলে বেঁচে থাকলে কি এসব মামলা-মোকদ্দমার কোন প্রয়োজন হত? অতুল জীবিত থাকতেও ইভা যদি এ ধরনের বেহায়াপনা করত, সে তার স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে তাকে ঠিক রাখত। কিন্তু শ্বশুর হয়ে অখিলবন্ধু তো আর তা করতে পারেন না।

আদালতে মামলার শুনানী উঠলে মনোরঞ্জনবাবু তাঁর মক্কেলের অভিযোগের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর মাস কয়েক যেতে না যেতেই ইভা কিভাবে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, কোলের ছেলেকে ফেলে রেখে শ্বশুর-শাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে সবই বললেন। আর বৃদ্ধ অখিলবন্ধু কত যত্নে নাতিকে লালন-পালন করেছেন, আশা-ভরসার একমাত্র পাত্র হিসাবে তাকে গড়ে তুলেছেন সে কথাও উল্লেখ করলেন। তারপর অখিলবন্ধুর স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইভা ছেলের ওপর কৃত্রিম দরদ নিয়ে ছুটে আসে। উদ্দেশ্য ছেলেকে

হাত করতে পারলে অখিলবন্ধুর সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত সেই ভোগ-দখল করবে। কারণ ঠাকুরদার একমাত্র উত্তরাধিকারী তো বাচ্চুই হবে। প্রথমে অখিলবন্ধুর অনুমতি নিয়েই বাচ্চুকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চায় ইভা। কিন্তু অখিলবন্ধু অনুমতি দিতে পারেন না। কারণ, যে আবহাওয়ায় তিনি মানুষ, যে পবিত্র শুচিতার মধ্যে তিনি একমাত্র পৌত্রকে মানুষ করে তুলতে চান, প্রভাতের বাড়ির পরিবেশ, তার নিজের চালচলন, স্বভাব-চরিত্র অখিলবন্ধুর আদর্শের একান্ত পরিপন্থী। তাই সেখানে নিজের বংশধরকে দু'একদিনের জন্যে পাঠাতেও নিষ্ঠাবান বৃদ্ধের মন সরেনি। কিন্তু ছলে-বলে, কলে-কৌশলে, যে-কোন উপায়ে ইভা দেবী নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে জানেন। তিনি বাচ্চা ছেলেকে প্রলুব্ধ করে, জামা-কাপড় গাড়ি ঘোড়ার লোভ দেখিয়ে বৃদ্ধের একমাত্র সম্বলকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে থাকলে বাচ্চুর মানুষ হবার কোন আশা নেই। কোন সৎ দৃষ্টান্ত, মহৎ আদর্শ বাচ্চুর সামনে প্রভাতবাবু, কি ইভা দেবী তুলে ধরতে পারবেন না। তাই বৃদ্ধ অখিলবন্ধু নিজের পৌত্রকে ফিরে পেতে চান। যিনি ন্যায়সঙ্গত আইনসঙ্গত অভিভাবক তাঁর হাতেই নাবালকের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণের জন্য আবেদনকারী আদালতের কাছে প্রার্থনা করেন।

সেদিনের শুনানী মুলতুবী হবার আগে আর একটি প্রশ্ন উঠল। মামলার বিচার যতদিন শেষ না হবে ততদিন বাচ্চু কার কাছে থাকবে? অখিলবন্ধু দাবী করলেন, তিনিই বাচ্চুর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। চৌদ্দটা বছর যদি তিনি তাই করে আসতে পেরে থাকেন এই কটা মাস পারবেন না?

ইভা দাবী করল তার নাবালক ছেলের দেখা-শোনা, নাওয়ানো

খাওয়ানোর ভার তার হাতেই দেওয়া হোক। অখিলবন্ধুর ঘরে কোন স্ত্রীলোক নেই। তাছাড়া তিনি এক বাতিকগ্রস্ত মানুষ। ছিট আছে তাঁর মাথায়। নিজের স্নানাহারেরই কিছু ঠিক নেই তাঁর। তাঁর হাতে নাবালক ছেলের ভালোমন্দের ভার ছেড়ে দিয়ে ইভা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। তাই মামলার বিচার যতদিন শেষ না হয়, ধর্মাবতার, ছেলেকে তার মার কাছেই থাকতে অনুমতি দিন।

হাকিম একটু ইতস্ততঃ করলেন। তিনি অবশ্য বাচ্চুকে কারো কাছে না পাঠিয়ে আলাদা জায়গায় রেখে দিতে পারতেন। এসব ক্ষেত্রে সে ধরনের সরকারী ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তেমন নির্দেশ দেওয়ার আগে তিনি বাচ্চুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথায় থাকতে চাও?'

বাচ্চু দেখল দুদিক থেকে দুজনে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঠাকুরদা আর তার মা। ঠাকুরদার মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখ দুটি কোটরে ঢুকেছে। এক চোখে ছানি পড়েছে অনেকদিন ধরে। চিকিৎসা করায়নি, এমন কৃপণ। অত সম্পত্তির মালিক, কিন্তু আটহাতি ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি পরে আদালতে এসেছে গরীব এক ভিখারির মত। বাচ্চুর বুকের ভিতরটা হা হা করে উঠল। মনে হল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে দাদুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মন স্থির করবার আগে হাকিম ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে বল কোথায় যেতে চাও, কার কাছে থাকতে চাও?'

বাচ্চু তার মার দিকে তাকাল। ইভার চোখমুখে দৃঢ় প্রত্যাশা আর আশ্বাস। আসবার সময় সে ছেলেকে প্রায় মুখস্থ করিয়ে

এনেছে, কোর্ট থেকে যদি জিজ্ঞেস করে তুই কোথায় থাকতে চাস, বলে দিবি আমার মার কাছে।

সেই মুখস্থ বুঝি এতক্ষণে বাচ্চুর মনে পড়ে গেল। হাকিমের দিকে তাকিয়ে সে এবার জবাব দিল, 'মার কাছে থাকব। দাদুর কাছে গেলে উনি মারবেন।' বক্তব্যকে জোরাল করবার জন্যে শেষ কথাটুকু বানিয়েই বলল বাচ্চু।

অখিলবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওরে হতভাগা, ওরে হারামজাদা, আমি তোকে মারব? আমি তোকে মারি? এমন কথা তুই বলতে পারলি? নিজের গায়ের রক্ত জল করে তোকে মানুষ করেছি তার প্রতিফল এই? ওই ডাইনী কুহকিনী তোকে যা শেখাচ্ছে তুই তাই বলবি?'

হাকিম বললেন, 'অর্ডার, অর্ডার।'

ধমক খেয়ে অখিলবন্ধু থেমে গেলেন।

হাকিম নির্দেশ দিলেন, মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চু তার মায়ের কাছে থাকবে। তবে অখিলবন্ধুর আদর্শের বিরোধী কাজ যেন তাকে দিয়ে না করানো হয়। তার পড়াশুনাও চালিয়ে যেতে হবে।

পনের দিন বাদে ফের শুনানীর তারিখ পড়ল।

কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে অখিলবন্ধু উত্তেজিতভাবে তাঁর উকিলকে বললেন, 'আমি আর মামলা করব না মনোরঞ্জনবাবু। আপনারা কোন কাজের নয়। আইন আদালত সব মিথ্যে। এখানে কোন সুবিচার হয় না।'

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, 'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন অখিলবাবু? অধীর হবেন না। আপনার নাতিকে যদি আপনার কাছে ফিরিয়ে এনে দিতে না পারি আমি আমার প্র্যাকটিসই ছেড়ে দেব এই কথা দিলাম।

সাত

মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে যে একটা জেদ আর উত্তেজক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তা উকিল মক্কেল দুজনকেই পেয়ে বসল। ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর, অবৈতনিক পাঠশালা, সংসারের সব কিছুর চেয়ে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে মামলাই অখিলবন্ধুকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল। জীবনে যেন এক নতুন উৎসাহ আর প্রেরণার সন্ধান পেয়েছেন অখিলবন্ধু। বেঁচে থাকার এক নতুন অর্থ দেখতে পেয়েছেন। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই কিন্তু মামলা আছে। সে অখিলবন্ধুর মনের সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে।

শুনানীর তারিখের আগে থেকেই তিনি তোড়জোড় শুরু করেন। প্রত্যেক সাক্ষীর কাছে একবারের বদলে তিনবার যান, তাদের কাছে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। উকিলের বৈঠকখানায় গিয়ে বসে থাকেন। তাঁর সঙ্গে নিজের মামলা সম্বন্ধে দুটো কথা বলবেন এই শুধু ইচ্ছা।

মনোরঞ্জনবাবু অন্য মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অখিলবন্ধুর দিকে দু-একবার বিস্মিত হয়ে তাকান।

'কি ব্যাপার? আপনি এখনও বসে আছেন? আপনার মামলার তারিখ তো আজ নয়। তার তো অনেক দেরি আছে।'

অখিলবন্ধু লজ্জিত হয়ে কৈফিয়তের সুরে বলেন, 'তা আছে অবশ্য। কিন্তু দেখুন, সাক্ষী তারাপদ দাসকে আমার বড় সুবিধে মনে হচ্ছেনা। সব গড়বড় না করে দেয়।'



মনোরঞ্জনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, 'ওসব নিয়ে আপনি কেন ভাবছেন? আমার হাতে যখন সব ছেড়ে দিয়েছেন আমিই সব দেখব। সাক্ষীদের কি করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয় আমি জানি। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান।'

অখিলবন্ধু উঠে পড়েন। নথি-পত্রের যে সব নকল এনেছিলেন বাড়িতে গিয়ে সেগুলি নাড়াচাড়া করতে থাকেন।

ইভাকে জব্দ করবেন, তার হাত থেকে বাচ্চুকে কেড়ে নেবেন এ ছাড়া অখিলবন্ধুর জীবনের যেন আর কোন বড় উদ্দেশ্য নেই।

সেদিন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস সরমা দাস অখিলবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এল। নলিনী যতদিন বেঁচে ছিলেন সরমা ছিল সহকারিণী। হেডমিস্ট্রেসের আসন শূন্য হওয়ায় সরমাকে সেই পদ দিয়েছেন অখিলবন্ধু। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। পাঁচ-ছয় বছর ধরে স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অনেকে বলে একা যায়নি। সরমার মাসতুতো বোনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। সরমা সিঁথিতে সিঁদুর পরে, পাড়ওয়ালা শাড়ি পরে, গায়ে গয়নাগাঁটি বেশি নেই, শুধু শাঁখা আর দু'গাছি করে চুড়ি আছে। শামলা রঙ, রোগাটে চেহারা। মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। ওর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নলিনী ওকে খুব স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে খেতে বলতেন, রাত্রে থাকতে বলতেন তাঁর কাছে।

অখিলবন্ধু অত যত্ন করতে পারেন না। কিন্তু খোঁজখবর নেন।

সরমা এসে দাঁড়াতেই নিজের কাগজপত্র সরিয়ে নিলেন অখিলবন্ধু। তার দিকে চেয়ে বললেন, 'কি মা, কেমন আছ?'

সরমা বলল, 'ভালোই আছি মেসোমশাই।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'তোমার স্কুল কেমন চলছে?'

সরমা বলল, 'দু'চারটি করে ছাত্র-ছাত্রী বাড়ছে। কিন্তু মেসোমশাই, আপনি তো আজকাল একবারও যান না। মাসীমা থাকতে রোজ যেতেন। রিলিজিআন ক্লাশগুলি আপনিই নিতেন। কিন্তু আজকাল আর ভুলেও স্কুল-ঘরে ঢোকেন না।'

অখিলবন্ধু হাসলেন, 'পাগলী মেয়ের কথা শোন। আগের মত আমার কি আর সময়-টময় আছে? দেখ না, কিভাবে মামলা-মোকদ্দমার জালে মাকড়সার মত জড়িয়ে পড়েছি। এ সব শেষ হলে তবে—।'

সরমা বলল, 'কিন্তু মেসোমশাই, মামলা-মোকদ্দমা যেমন, আপনার স্কুলটাও তো তেমনি আপনার নিজের। আপনি যদি একটু খোঁজ-খবর না নেন, তাহলে কি ভালো দেখায়?'

লজ্জিত হলেন অখিলবন্ধু। বিবেকের কাছে ভারি অপরাধী মনে হল নিজেকে। সত্যি, মামলা করে অনেক কর্তব্য কাজেরই অবহেলা করেছেন। জমিতে বাগানে অনেক আগাছা গজিয়েছে। ঘর-দোর অগোছালো আর অপরিষ্কার হয়ে গেছে। স্ত্রী আর ছেলের সমাধির কাছে তেমন প্রশান্ত মন নিয়ে দু'দণ্ড আর কাটিয়ে আসতে পারেন না। এমন কি, চার্চের সার্ভিসের সময়েও মনের সেই একাগ্রতা ফিরিয়ে আনতে কষ্ট হয়। এক বাচ্চুর জন্যে তাঁর যে সব যাবে, তা কি তিনি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন?

সরমা অখিলবন্ধুকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'মেসোমশাই, আপনার মনে আঘাত দিয়ে অপরাধ করে ফেলেছি। আপনি কি রাগ করলেন?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'না মা, রাগ করব কেন? তুমি ঠিক

কথাই বলেছ। সত্যি, বাচ্চুর জন্যে আমার সব ধর্ম-কর্ম গেছে। ছোঁড়াটা আমার পরম শত্রু, বুঝলে ? এই বুড়ো বয়সে কি দৌড়টাই না আমাকে করাচ্ছে।'

সরমা এ-কথার কোন জবাব দিল না। বরং আগের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে বলল, 'ঘরদোরের কি ছিরিই করে রেখেছেন মেসোমশাই। আপনার লোকজন কোন কাজের নয়। দেখুন দেখি, ঝুলটুল পড়ে কি দশা হয়েছে ঘরের।

অনুমতির অপেক্ষা না করে সরমা অখিলবন্ধুর ঘরখানার ঝাড়পোছ আরম্ভ করল। ঝুল ফেলল, ধুলো ঝাড়ল, বইপত্রগুলি গুছিয়ে রাখল। দেয়ালে অতুল আর নলিনীর দুখানা এন্‌লার্জ করা ফটো টাঙানো আছে। অনেকদিন আগে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন অখিলবন্ধু। কবে যে শুকিয়ে গেছে তা আর খেয়াল নেই।

সরমা বলল, 'এই শুকনো মালা দুটো ফেলে দেব ?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'ফেলে দেবেনা তো কি করবে ? দাঁড়াও, আমি টাটকা ফুল নিয়ে আসছি। বাগানে তো ফুলের অভাব নেই। কিন্তু মালা আর কে দেবে গেঁথে ?'

বলতে বলতে অখিলবন্ধু তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদে কোঁচার খুঁটে করে সাদা টগর নিয়ে এলেন। সরমার দিকে চেয়ে বললেন, 'নাও মা, মালা গেঁথে দাও। আজ এই বুড়ো ছেলেকে না খাইয়ে তুমি এখান থেকে নড়তে পারবে না। আমি তোমার দাদা বউদির কাছে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি তুমি এবেলা আমার এখানেই আছ। সন্ধ্যার আগে হেড মিষ্ট্রেসের ছুটি নেই।'

হাসতে লাগলেন অখিলবন্ধু।

সরমা দুটো মালাই গাঁথল। প্রথমটা নলিনীর ফোটোতে পরিয়ে দিল। দ্বিতীয় মালাটি সুদর্শন যুবকের প্রতিকৃতিতে পরাতে গিয়ে কেমন যেন লজ্জা করল তার। ইতস্তত করতে লাগল সরমা।

অখিলবন্ধু তা লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'পরাও মা, পরাও, লজ্জা কি। ও তো আর নেই, শুধু ওই স্মৃতিটুকু আছে। সংসারে তুমি এক অভাগিনী, আর আমি এক হতভাগা। আমরা একজন যদি অন্যের দুঃখ না বুঝি কে বুঝবে বল?'

ফোটোটাতে মালা পরিয়ে অখিলবন্ধুর দিকে ফিরে তাকাল সরমা। অখিলবন্ধুও তার দিকে চেয়ে রইলেন। দুজনেরই চোখ ছল ছল করছে।

আট

নিজের মায়ের কাছে থেকেও বাচ্চুর মনে সুখ ছিল না। মামলা আরম্ভ করে দেওয়ার পর ইভা আর প্রভাতের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া লাগে। কথায় কথায় তুমুল চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে যায়। প্রভাত বলে, 'তোমার জন্যেই আমি সর্বস্বান্ত হলাম। যা হতচ্ছাড়া বখাটে একটা ছেলে, তার দখলী স্বত্ব নিয়ে আবার মামলা মোকদ্দমা।' ইভা বলে, 'কে তোমাকে বলছে মামলা করতে, তোমাকে তো আর মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। তোমার ক্ষমতা না থাকে, স্ত্রীর অপমানের শোধ তুলবার মত তোমার ট্যাঁকের জোর না থাকে নাকে খত দিয়ে ক্ষমা চাও গিয়ে,। কিন্তু আমি তা করতে যাব না। গায়ের গয়না বিক্রি করে আমি হাইকোর্ট অবধি লড়ব।'

প্রভাত গজ গজ করতে করতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফেরে মদে চুর হয়ে। স্ত্রীর সঙ্গে মুখে যত তর্কাতর্কিই করুক কাজে একটুও তার বিরোধিতা করতে পারে না প্রভাত। স্ত্রীর সব ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়। কিন্তু যখনই মনে হয় তাতে নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তখনই জোর গলায় গালাগালি চেঁচামেচি করতে থাকে।

বাচ্চুকে নিয়ে পিসিশাশুড়ীর সঙ্গেও ইভার রোজ ঝগড়া লাগে। তিনি বলেন, 'কোত্থেকে একটা মুখপোড়া হনুমানকে জুটিয়ে এনেছে ঘরে আগুন লাগাবার জন্যে। আমার সুখের সংসার ছারখার করে ছাড়ল।'

ইভা জবাব দেয়, 'মুখপোড়া মুখপোড়া করবেন না পিসীমা, ও আমার ছেলে। আমি নিজের ইচ্ছায় ওকে আমার কাছে রেখেছি। আপনার তাতে যদি অসুবিধে হয় আপনি অন্য ব্যবস্থা দেখুন, যেখানে গিয়ে শান্তি পান সেখানে থাকুন।'

পিসিশাশুড়ী হাত পা নেড়ে মুখ বিকৃত করে কদর্য ভাষায় ঝগড়া করতে থাকেন, 'হতচ্ছাড়ী পাজী বদমাস মাগী কোথাকার। তোর তো এখন তাই ইচ্ছে। আমাকে এ সংসার থেকে তাড়াতে পারলেই বাঁচিস। আমি যে ছেলেবেলা থেকে প্রভাতকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, কোলে পিঠে করে টেনে বেড়িয়েছি তুই তখন কোথায় ছিলি হতচ্ছাড়ী? আজ ছেলে ছেলে করে প্রাণ একেবারে উথলে উঠেছে। ছেলের ওপর যে কত টান তা যেন কারো জানতে বাকি আছে। কোলের ছেলেকে তুইই না ফেলে পালিয়েছিলি?'

ইভা বলে, 'চুপ করুন। সে সব পুরোন কথা কে আপনাকে তুলতে বলেছে? পালিয়েছি তো বেশ করেছি।'

পিসিশাশুড়ী বলেন, 'বিধবা তো আমরাও হয়েছি। লোভও মানুষ কম দেখায় নি, কিন্তু বেলেল্লাপনা করেছি কি? পেটে ধরিনি, তবু ওই প্রভাতের মুখ চেয়েই পড়ে রয়েছি। দিনরাত বুকে করে আগলে রেখেছি। তোর ওই মেনিমুখো মেড়াকাণ্ড সোয়ামীকেই জিজ্ঞেস করনা। বলুক এসে, সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি। আমার একটা কথাও অস্বীকার করুক দেখি একবার। আজ তোর এতবড় আস্পর্ধা হয়েছে তুই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাস।' এরপর প্রভাতের পিসীমা গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করেন।

বাচ্চুর সামনেই এইসব ঝগড়াঝাঁটি কাঁদাকাটি চলতে থাকে।

বড় বিশ্রী লাগে তার। বিরক্তির আর শেষ থাকে না। শুধু নাওয়া খাওয়া আর ঘুমোনোর সময়টুকু ছাড়া বাচ্চু বাইরে বাইরেই কাটায়। টো টো করে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। পাড়া ছাড়িয়ে এসে বিড়ি সিগারেট খায়। দোকানদারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করে। তবে চেনা মানুষের চেয়ে অচেনা মানুষ ভাবে আত্মীয়ের চেয়ে পর ভালো। কখনো বা বড় রাস্তার মোড়ে এসে চলন্ত ট্রাম বাসগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে বাচ্চু। কত লোক যায়, কত লোক আসে। কোন চেনা লোক, কোন চেনা মুখ চোখে পড়ে না। এই ভালো, এই ভালো। চেনা ছুনিয়ার চেয়ে অচেনা ছুনিয়াই ভালো। তবু একখানি চোয়ালভাঙ্গা কদাকার অতি পরিচিত চেনা মুখের জন্যে মাঝে মাঝে বাচ্চুর বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। ইচ্ছা করে, ছুটে চলে যায় তাঁর কাছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের মধ্যে। ছুহাতে সেই শীর্ণ শুকনো জরায় জীর্ণ মানুষটিকে জাপটে ধরে বলে, 'দাছু, আমি এসেছি, আমি ফিরে এসেছি।'

কিন্তু সাহস পায় না বাচ্চু। কোনদিন বাসে করে, কোনদিন পায়ে হেঁটে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত যায়। কিন্তু মোড় পার হয়ে বারাসতের বাসে কিছুতেই উঠে বসতে পারে না। কে জানে, দাছু হয়তো লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন। ছু এক ঘা মেরেও বসতে পারেন। কিংবা গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে দিতে বলবেন, 'দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা। তোকে আর চাইনে আমি।'

বাচ্চুর যাওয়া আর হয় না। ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার পর ফের ঘরেই ফিরে আসে। যে ঘর তার নিজের নয়, তার মার। তার আর এক জন্মের মার।

সম্বর্ধনাটা বিশেষ ভালো হয় না। ইভা ছেলেকে দেখে মুখ

খিঁচিয়ে ওঠে। তার মূর্তি দেখে বাচ্চুর ভয় হয়, রান্নার হাতা দিয়েই বুঝি বা এক ঘা তার পিঠে বসিয়ে দেয়।

ইভা চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'হতভাগা হতচ্ছাড়া কোথাকার। কোথায় ছিলি সারাদিন বল্ তো? পড়া নেই শুনো নেই শুধু খাবি আর সারাদিন ধর্মের ষাঁড়ের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবি?'

ইভা ঝাঁজালো গলায় আবার বলে, 'হতভাগা। ওই এক অজুহাত পেয়েছে। স্কুলে ভর্তি করে দিলে না, স্কুলে ভর্তি করে দিলে না। ভর্তি করবার সময় থাকলে তো দিতামই। বইপত্তর কিনে দিয়েছি বসে বসে পড়। হাতের লেখাটা ভালো কর। কিন্তু লেখাপড়ার ধারে-কাছেও তুই হাঁটবিনে। কেবল বকাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিবি। তোর কপালে দুঃখ আছে আমি তার কি করব।'

বাচ্চুর মনে হয়, মা আর তাকে ভালোবাসে না। পড়াশুনার অছিলা করে তাকে শুধু বকে। মামলা-মোকদ্দমায় টাকা নষ্ট হচ্ছে বলে ভিতরে ভিতরে মার মনেও চাপা রাগ আছে। সেইজন্যেই মা তাকে দু-চোখে দেখতে পারে না। এ পক্ষের ছেলেমেয়ে দুটোকে তো খুব আদর করে। কই, তাদের তো কথায় কথায় মুখ ঝামটা দেয় না। হতভাগা হতচ্ছাড়া বলে গালাগাল করে না।

বাচ্চুর এক এক সময় ইচ্ছে হয় সে এখান থেকে চলে যায়। না, বারাসত-টারাসত নয়। অনেক দূরের কোন দেশে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে বাচ্চুর। যেখানে কেউ আর তার কোন খোঁজ পাবে না। বাচ্চু কখনো কল্পনা করে জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়ে সমুদ্রে ভাসবে, কখনো ভাবে প্লেনের পাইলট হয়ে

আকাশে উড়বে কিন্তু কোন কিছুই হয় না। এদের পোষা বিড়াল-কুকুরের সামিল হয়ে গেছে বাচ্চু। লাথি-ঝাঁটা খেয়েও এখান থেকে তার নড়বার জো নেই।

শুধু কোন কোন দিন রাত্রে অবস্থাটা একেবারে পালটে যায়। সারাদিন বকাবকি করে মুখঝামটা মেরে রাত্রে নিজের ঘরে শুতে যাওয়ার আগে কি মনে হয় ইভার। আস্তে আস্তে ঘুমন্ত ছেলের পাশে এসে বসে। মাথায় পিঠে হাত বুলোয়, আলগোছে হাতখানা রেখে একটুকাল চুপ করে বসে থাকে। বাচ্চু ঘুমোয় না, ঘুমের ভান করে ঘুমন্ত মানুষের মতই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। শুধু এই স্পর্শটুকুর লোভেই বাচ্চু এখান থেকে নড়তে পারেনা।

নয়

সেদিন ব্যারাকপুর থেকে ফিরে এসে শরীরটা বড় খারাপ লাগতে লাগল অখিলবন্ধুর। ক'দিন ধরেই কড়া রোদ উঠেছে। আর সেই রোদের ভিতরেই অখিলবন্ধু নিজের হাতে বাড়ির আর বাগানের ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করছেন। হাতে একখানা ধারালো দা, পরণে আট হাত ধুতি। গা বেয়ে দরদর ধারে ঘাম ঝরছে। কিষাণ-কামলাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যখন কাজ করে যাচ্ছেন তাঁকে আর আলাদা করে চিনবার জো নেই।

কামলারা বারবার নিষেধ করেছিল, 'বড়কর্তা, আপনি এই রোদের মধ্যে অত খাটবেন না। বুড়ো হয়েছেন, সেই রক্তের জোর তো আর নেই। শেষে একটা অসুখ-বিসুখ হয়ে বসবে।'

অখিলবন্ধু প্রতিবাদ করে বলেছেন, 'কিছু হবে না। এখনো তোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাটতে পারি তা জানিস? রোদে বৃষ্টিতে আমার কিছু হয় না তা জানিস?'

এই বয়সেও খাটবার, রোদবৃষ্টি সহ্য করবার ক্ষমতা অখিলবন্ধুর অসাধারণ। তা নিয়ে পাড়ার সবাই বলাবলি করে। এই বয়সেও প্রাণশক্তি আছে বটে বুড়োর। কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করতে পারেন। এত খাটবার কোন দরকার অবশ্য নেই। বিষয়সম্পত্তি যা আছে, তাতে পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেতে পারেন। কিন্তু বসে খাওয়ার অভ্যাস মোটেই নয় তাঁর। ছুটোছুটি করে কাজকর্ম না করতে পারলে তাঁর যেন ভাত হজম হয় না, মনে শান্তি আসে

না। কিন্তু ইদানিং মামলা মোকদ্দমা শুরু হবার পর অখিলবন্ধুর শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল। প্রতিবেশীরা বলত, 'ছেলে কি বউ মারা যাওয়াতেও বুড়োকে এমন ভেঙে পড়তে দেখিনি। নাতি বেহাত হয়ে যাওয়ার পর বুড়ো যেন একেবারে আধখানা হয়ে পড়েছে।'

অখিলবন্ধু বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। শরীরে কিসের একটা অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন অখিলবন্ধু। দু'জন কামলা বারান্দায় বসে গরুর দড়ি পাকাচ্ছিল। কর্তার অবস্থা দেখে তারাই বিমল ডাক্তারকে খবর দিল।

বিমলবাবু এসে রোগীর টেম্পারেচার নিলেন, জিভ দেখলেন। বুক পরীক্ষা করলেন। তারপর মুখভার করে একজন কামলাকে ডেকে বললেন, "একজন তোমার সরমা দিদিমণিকে একবার খবর দাও তো।'

অখিলবন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'কেমন আছেন বিশ্বাসমশাই?'

'ভালো।'

'আজ আবার ব্যারাকপুর গিয়েছিলেন কেন? আজও আপনার মামলার তারিখ ছিল নাকি?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'না। মামলার খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম। দু'মাস ধরে কেসটা চলছে তো চলছেই। কবে রায় বেরুবে তার খবর আনতে গিয়েছিলাম। সাক্ষীদের জেরা শেষ হয়ে গেছে, সওয়াল শেষ হয়ে গেছে, এখন রায়টাই শুধু বাকি।'

বিমলবা[illegible] বললেন, 'বেরোবেই একদিন। আপনি ওসব নিয়ে আর ভাববেন না। শান্তভাবে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন তো।'

অখিলবন্ধু বললেন, 'সামনের ১৭ই আবার শুনানীর তারিখ।

পেশকার বললেন, ওইদিনই জাজমেন্ট বেরোবে। রায় নাকি আমার ফেভারেই যাচ্ছে। যায় তো ভালো। না গেলে আমি হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্ট অবধি লড়ব। সহজে ছাড়ব না।' বলতে বলতে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অখিলবন্ধু।

বিমলবাবু তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন।

স্কুল ছুটি দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল সরমা। অখিলবন্ধুর অসুখের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এল। বিমলবাবুকে সামনে পেয়ে বলল, 'কি অসুখ ডাক্তারবাবু?'

বিমলবাবু বাইরে এসে বললেন, 'sun stroke-এর মত হয়েছে। দুর্বলও হয়ে পড়েছেন খুব। এই অবস্থায় ওঁকে একা রাখা ঠিক হবে না। একজন নার্সের ব্যবস্থা করা দরকার।'

সরমা বলল, 'নার্সের দরকার হবে না। মেসোমশাইয়ের সেবা আমি নিজের হাতে করতে চাই।'

বিমলবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনি পারবেন তো?'

সরমা বলল, 'পারব। আমার অভ্যাস আছে।'

অসুখের খবর পেয়ে বিমলবাবুর স্ত্রীও অখিলবন্ধুকে দেখতে এলেন। এই পরিবারের শুভ অশুভ অনেক ঘটনারই তিনি সাক্ষী। আজও এলেন। বললেন, 'বিশ্বাসমশাই, কেমন আছেন?'

অখিলবাবু বললেন, 'ভালো। খুব ভালো আছি মা। আপনি কেন বসে আছেন। রাত হয়ে গেল। আপনি বাড়ি যান।'

বিমলবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আমার জন্য ভাববেন না। আচ্ছা, আপনার কি বাচ্চুকে দেখতে ইচ্ছে হয়? তাকে খবর দেব?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'খবর দিলেও তারা আসতে দেবে কেন? না মা, আর কারো কোন খোঁজখবর নিয়ে দরকার নেই। কোর্ট

তো এখনো তার ভার আমার ওপর ছেড়ে দেয়নি। আমি তার কে ?'

গভীর অভিমানে পাশ ফিরে চুপ করে রইলেন অখিলবন্ধু।

বিমলবাবুর স্ত্রী যাওয়ার আগে সরমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'লক্ষণটক্ষণ আমার তো ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি একটু সাবধানে থেকো। আর দরকার হলেই আমাদের খবর পাঠিয়ো। যত রাতই হোক কোন সঙ্কোচ কোরো না। আজ রাত্রে হয়ে উঠবে না। বাচ্চুকে কাল ভোরেই আমি খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

বিমলবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন। সরমা এই রুগ্ন বৃদ্ধের সেবার জন্যে এখানে রয়ে গেল। নিজের বাবার কথা মনে পড়ল সরমার। তাঁর মৃত্যুশয্যায় সরমা আর তার বউদি পালা করে রাত জাগত। মাসখানেক ধরে পেটের আলসারে ভুগেছিলেন তিনি।

রাত, অন্ধকার আর স্তব্ধতা একই সঙ্গে বেড়ে চলল। সারা বাড়িটা যেন থম থম করছে।

সরমা রোগীকে ওষুধ খাওয়াল। সাবু আর ফলের টুকরো দিতে চাইল। কিন্তু অখিলবন্ধু কিছুতেই ওসব নিলেন না। তিনি ঘুমিয়েছেন মনে করে সরমা আবার এসে চেয়ারখানায় বসল।

অসমাপ্ত বইখানার পাতা উল্টাতে লাগল। নামকরা আধুনিক লেখকের উপন্যাস। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে মনটাকে যেন তেমনভাবে নিবিষ্ট রাখতে পারল না সরমা। দেওয়ালের সেই প্রতিমূর্তি এখনো তার দিকে চেয়ে আছে। অখিলবন্ধুর ছেলের সেই ফোটো। এক মৃত যুবকের ক্ষীণ স্মৃতিচিহ্ন। আরো কয়েকদিন এসে শুকনো মালাটা বদলে নতুন মালা চুপে চুপে পরিয়ে দিয়ে গেছে সরমা।

এত লজ্জা, এত লুকোচুরির কোন মানে হয় না। তবু লজ্জা পেয়েছে সরমা। তার স্বামী যদি বিশ্বাসঘাতক না হয়ে অকালমৃত হত, তার স্মৃতি নিয়েও বোধ হয় এমনি করে সরমা সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু বৈধব্যের চেয়েও বেশি শাস্তি পেয়েছে সে। আরো বেশি জ্বালা আর অপমান সহ্য করতে হচ্ছে তাকে।

'মা সরমা?'

সরমা চমকে উঠল। তারপর চেয়ার ছেড়ে রোগীর বিছানার কাছে এসে বসে তাঁর কপালে হাতখানা রেখে বলল, 'আপনার কি কষ্ট হচ্ছে মেসোমশাই?'

অখিলবন্ধু বললেন, 'না মা, তোমাকেই বরং কষ্ট দিচ্ছি, যাও, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। কিছু খেয়েটেয়ে নিয়েছ তো?'

সরমা বলল, 'আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না মেসোমশাই। আমি সব ব্যবস্থা করে নেব। আপনি একটু ঘুমোন এখন।

কিন্তু অখিলবন্ধুর বোধ হয় কথা বলতেই ভালো লাগছিল। তিনি বলতে লাগলেন, 'আমার আপনজন সব পর হয়ে গেল আর তুমি পরের মেয়ে, তুমিই এই বিপদের সময় সবচেয়ে আপন হলে। সংসারে কে যে আপন কে যে পর বোঝা ভার। রক্তের সম্পর্ক-টম্পর্ক সব মিথ্যে।'

একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'আমার যা আছে, সব আমি তোমাদের স্কুলকে দিয়ে যাব। ট্রাস্টিদের মধ্যে তুমিও থাকবে। তোমার ওপর ভার থাকবে দেখাশোনার, আমি আর কাউকে কিছু দেব না। কে আছে আমার যে দেব, কার জন্যে রেখে যাব! তার চেয়ে আমার যা আছে তা তোমাদের দশজনের কাজে লাগুক, সেই ভালো।'

সরমা বলল, 'আপনি এবার ঘুমোন মেশোমশাই। নইলে আমি কিন্তু অনেক রাগ করব।'

যেন সরমার অসন্তুষ্টির ভয়েই চোখ বুজলেন অখিলবন্ধু। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেন না তিনি। একটু বাদে ফের বলে উঠলেন, 'ভালো কথা সরমা, আমার জমাখরচের খাতাটা আনো তো।'

সরমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'এই দুপুর রাত্রে খাতা দিয়ে কি করবেন মেসোমশাই?'

তিনি বললেন, 'আজ খরচটা লেখা হয়নি। লিখব। তুমি নিয়ে এসো। কি কি খরচ করলাম আলাদাভাবে ঠিক মনে করতে পারছি না। কি কি খরচ করলাম বল তো?'

অখিলবন্ধুর জ্বর, বকুনি, ছটফটানি পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল।

দশ

অখিলবন্ধুর অসুখের খবর ইভাদের বাড়ির কেউ বিশ্বাসই করল না। ভাবল, বুড়োর এ একটা চাল। প্রভাত বলল,—অসুখের নাম করে, বাচ্চুকে বুড়ো কাছে নিয়ে যেতে চাইছে।

ইভা বলল, 'বেশ তো, যাক না চলে। ও এখানে থাকুক তা তো তুমি চাও না।'

প্রভাত চটে উঠে বলল, 'তোমার মত নেমকহারাম মেয়েমানুষ আর দুনিয়ায় নেই। মামলায় এত টাকা জলের মত ব্যয় করলাম, আর তুমি বলছ ওকে রাখতে চাইনে? খবরদার বাচ্চু, আমার পারমিশন ছাড়া এ-বাড়ি থেকে এক পা বাড়াবি তো তোর হাড়গোড় আমি চুরমার করে দেব।'

ইভা বলল, 'বাঃ, কি অভ্যর্থনাই করছ ছেলেকে। আদরের বালাই নিয়ে মরি।'

মামলা যখন চলছে, উকিলের পরামর্শ না নিয়ে বাচ্চুকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে ইভা আর তার পিসিশাশুড়ীর মধ্যে কোন মতভেদ রইল না। কিসে কি হবে, শেষে উকিল আরো ধমকাবেন। শুধু ধমক দিয়েই যে নিরস্ত থাকবেন তা নয়। একরাশ টাকা খসিয়ে তবে ছাড়বেন। তাই ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে বাচ্চুকে তার দাদুর কাছে পাঠান উচিত হবে না। আর অসুখের খবর যদি সত্যিই হয় অরজারি কইতো নয়। এমন ব্যস্ত হবার কি আছে?

কিন্তু এসব যুক্তিতে বাচ্চু শান্ত হয়ে থাকতে পারল না। সারাদিন সে ছটফট করতে লাগল আর ঘুরে ঘুরে বারবার জিজ্ঞাসা করল, 'মা যাবে না দাদুকে দেখতে। চল যাই, দেখে আসি।'

ইভা বলল, 'দাঁড়াও বাপু। কোথাও যেতে হলে তো তুমি এক পায়ে খাড়া কিন্তু জেনে শুনে তো যেতে হবে। উনি বললেন উকিলের কাছে জিজ্ঞেস করবেন। শুনে-টুনে আসুন তারপরে যেয়ো।'

শ্বশুরের ওপর মন প্রসন্ন ছিল না ইভার। মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে সে নিজের উকিলকে দিয়ে ইভাকে যথেষ্ট অপমান করেছে। অনর্থক কলঙ্ক রটিয়েছে। আদালত ভরতি লোক ইভাকে দেখে হেসেছে। ছি-ছি করেছে। অখিলবন্ধুর সাক্ষীরা কত যে মিথ্যা কথা বলেছে তার ঠিক নেই। এই শত্রুতা কি ইভা সহজে ভুলতে পারবে?

কিন্তু বাচ্চুর ছটফটানি গেল না। সারাদিন কিসের একটা অস্থিরতার মধ্যে তার দিন কাটল। রাত্রে ঘুমোবার আগে তার দাদুর কথা মনে পড়তে লাগল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, তার দাদু ঠাকুরমার মতই শক্ত অসুখে ভুগছে। আর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ডাকছে, 'বাচ্চু, এদিকে আয়, আমার কাছে আয়।'

ভোরে উঠে বাচ্চু কাউকে কিছু বলল না। চা-টা কিছু খেল না। বারাসত থেকে যে-ভাবে মাণিকতলায় পালিয়ে এসেছিল, ঠিক তেমনি করে এক জামা-কাপড়ে পালিয়ে চলে গেল।

বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন উঠোনে পাড়াপড়শীর দল ভেঙে পড়েছে। কৃপণ অখিলবন্ধু এত দুঃস্থ মানুষকে যে গোপনে সাহায্য করতেন তা অনেকেরই জানা ছিল না। কেউ এসেছে

উপকারী মানুষকে দেখতে, কেউ এসেছে একজন সৎ ধার্মিক ট্রু ক্রিশ্চিয়ানের শেষ দেখা পেতে।

ভিড় ঠেলে বাচ্চু কোনরকমে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিমলবাবুর স্ত্রী আর সরমা দু'জনেই অখিলবন্ধুর মৃতদেহের পাশে বসেছিল। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপে না করে বাচ্চু অখিলবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'দাদু, আমার দাদু!'

সরমা অতি কষ্টে তাকে ছাড়িয়ে নিল। বিমলবাবুর স্ত্রী বাচ্চুর পিঠে আর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

অখিলবন্ধু উইল করে যাওয়ার কথা শুধু মুখেই বলেছেন। কিন্তু করে যাওয়ার আর সময় হয় নি। কিংবা করে যেতে মন ওঠেনি। নাতির ওপর যে দুর্বলতা ছিল তা হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত।

তাঁর মাথার কাছে বড় বাইবেলখানা আর জমা-খরচের খাতাটি তখনও পড়ে ছিল। এক ফাঁকে সেই খাতাটা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখল বাচ্চু। মামলার খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব। কোন তারিখে কত টাকা উকিল নিয়েছে, মুহুরী কত নিয়েছে, পেশকারকে কত দিতে হয়েছে, সাক্ষীদের জলখাবার আর পান-সিগারেট বাবদ গেছে কত টাকা, সব লেখা আছে। আর ফাঁকে ফাঁকে দু'চার লাইনে মন্তব্য। এ শুধু অখিলবন্ধুর জমা-খরচের খাতা নয়, তাঁর ডায়েরিও। কোথাও আফশোস, কোথাও-বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। পাতা উল্‌টাতে উল্‌টাতে শেষের দিকে একটা জায়গায় চোখ পড়ল বাচ্চুর। দাদু লিখে রেখেছেন, 'বাচ্চু, তোকে আমি নিশ্চয়ই ফিরে পাব। এ শুধু উকিল মুহুরী নাজির পেশকারের আশ্বাস নয়। আমার বুকের ভিতর থেকে দিনরাত এ-কথা একজন

আমাকে বলছেন, তুই আসবি, ফিরে আসবি। তোকে আমি পাব, কিন্তু মানুষ করে যাওয়ার সময় পাব তো?' আর একদিনের ডায়েরিতে আশ্বাসের কথা আছে। 'নাইবা পেলাম। আমার আর সাধ্য কতটুকু। আমি একা তোর কীই-বা করতে পারতাম। পৃথিবীতে এত বড় বড় মহাপুরুষ এসেছেন, এখনো কত ভালো ভালো মানুষ আছেন। তুই তাদের পথ ধরে চলিস, তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিস। দুনিয়ায় তোর অভিভাবকের অভাব হবে না।'

অন্ত্যেষ্টির উদ্যোগ-আয়োজন চলতে লাগল। লোক গেল চার্চের বিশপকে খবর দিতে। লোক ছুটল কফিন আর ফুলের মালা আনতে। কিন্তু বাচ্চুর এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না। এ সব কাজ যেন তার নয়। সে একখানা সাদা কাগজে লাল কালিতে বড় বড় হরফে লিখতে লাগল, 'অখিলবন্ধু শিশু-শিক্ষা সদন।'

গদের শিশিটা খুঁজে নিয়ে কাগজের পিছনে আঁঠা লাগাল। তারপর লম্বা মইখানা কাঁধে নিয়ে স্কুল-ঘরটার দিকে এগিয়ে চলল।

হেডমিস্ট্রেস সরমা ছুটে এল পিছনে পিছনে।

বাচ্চু মইয়ের ওপর থেকে বলল, 'সাইনবোর্ডটা পালটে দিচ্ছি মাসীমা।'

সরমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আজই ওসব করার কী দরকার হল। কাণ্ড দেখ পাগলের!'

কথাগুলি বাচ্চুর কানে গেল কি না বোঝা গেল না। সে ততক্ষণ মইয়ের উঁচু ধাপে উঠে সাইনবোর্ড আঁটতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।